পিয়াসী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পাঁচ সিকা

পূর্ব্বকথা

পিয়াসী প্রকাশিত হইল। হারামণি গল্পটি পূজার বার্ষিক আগমনীতে প্রথম বাহির হইয়াছিল, বাকি তিনটি বাহির হইয়াছিল, ভারতীতে।

১৭নং মোহনবাগান রো

কলিকাতা, ১লা আষাঢ়, ১৩২৯।

সৌরীন্দ্র

পরম স্নেহাস্পদ অনুজ

শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু—

সূচী

পিয়াসী

হারামণি

নাকে-মুখে কোনমতে চারটি ভাত গুঁজিয়া মনমোহন তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া দড়িতে খাটানো কামিজটা তুলিয়া যেমন গায়ে দিতে যাইবে, অমনি পিঠের কাছটা ফ্যাঁস্ করিয়া ফাঁসিয়া গেল। মনমোহন রাগিয়া কামিজটা মেঝেয় ফেলিয়া দুই পায়ে সেটাকে চাপিয়া ধরিল। স্ত্রী শান্তি পাণ লইয়া শশব্যস্তে ঘরে আসিয়া স্বামীর সে মূর্ত্তি দেখিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, বলিল,—হলো কি?

মনমোহন গর্জ্জিয়া উঠিল,—হবে আর কি! বেরুবার সময় জামাটা ছিঁড়ে বস্‌লুম! এখন সেলাই কর্‌তে গেলে অফিস যেতে দেরী হবে।

শান্তি মনমোহনের পানে চাহিয়া দেখিল, মুখ তাহার বিরক্তির আঁধারে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

শান্তি বলিল,—তা ভাব্‌চ কেন? বসো, আমি আর-একটা জামা বের করে দিচ্ছি।

—জামা কোথায় যে বের করবে? দুটো এ ধোপে কাচ্‌তে দেছ ত। তখন বল্‌লুম অত করে, একটা কাচ্‌তে দাও, আর একটা বাড়ীতে সাবান দিয়ে জলকাচা করে রাখো, তা ত শুন্‌লে না!

শান্তি বলিল,—মা গো, সেটা জল লেগে মসে ধরে কি হয়েছিল, বল দিকি! সে গায়ে দিয়ে মানুষ বাইরে বেরুতে পারে কখনো?

—এখন উপায়—? মনমোহন হতাশভাবে শান্তির পানে চাহিল।

শান্তি বলিল,—তুমি পাণ খাও, আমি টক্ করে টেঁকে দিচ্ছি। এখনই হয়ে যাবে'খন।

মনমোহন একটা পাণ মুখে দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। শান্তিও ছুঁচ-সুতা লইয়া কামিজ সেলাই করিতে বসিল; সেলাই করিতে করিতে বলিল,—আজ আস্‌বার সময় একপো সাবান এনো দেখি, রাত্রে সাবানে কেচে রাখব'খন। জামা ময়লা হলেই ছেঁড়ে শিগ্‌গির। আর তাও বলি, চারটে জামা না হলে চলেও না। দুটো করে যদি গায়ে দাও—

এ কথায় মনমোহন একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল,—অঢেল পয়সা দেখ্‌চো না! নিত্যি তোমার ছেলে-পিলের ব্যামো, তাদের ওষুধের খরচ থেকেও যদি একমাস রেহাই পাই, তা হলেও নয় জামা-কাপড় কেনা যায়। তা ত নয়—

শান্তির মুখ নিমেষে পাংশু হইয়া গেল! ছেলেমেয়েদের

অসুখ নিত্য লাগিয়া আছে—কথাটা খুবই সত্য! কিন্তু ইহাতে তাহার কি হাত আছে! কি দোষ তার! সে কি করিবে! তবুও আপনাকে সকল অপরাধের মূল ভাবিয়া দুঃখে লজ্জায় সে একেবারে এতটুকু হইয়া গেল।

জামা সেলাই তখনই হইয়া গেল। মনমোহন কামিজটা গায়ে দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র হরমোহন আসিয়া বলিল,—দু'মাসের মাইনে বাকী আছে বাবা। আজ না দিলে স্কুলে নাম কেটে দেবে বলেছে।

মনমোহন গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—দিক্ নাম কেটে—আপদ্ চোকে তাহলে! বেটারা যেন কশাইয়ের মত সব বসে আছে—খালি টাকা আর টাকা। মানুষ দেবে কোত্থেকে, তা ভাবে না একবার!

শান্তি ছেলেকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল,—বলিস্ বুঝিয়ে, আর দু-একদিনের মধ্যেই মাইনে দেব'খন!

পুত্র শুনিল না, বলিল,—বা রে, রোজ রোজ খ্যাচ্-খ্যাচ্ করে অত ছেলের সাম্‌নে। আমি তাহলে স্কুলে যাব না, আজ, মাইনে না দিলে—

মা ধমক দিল,—যাস্‌নে। ভারী বিদ্যে হচ্ছে ত স্কুলে গিয়ে—

মনমোহন জামা গায়ে দিয়া চলিয়া যাইতেছিল; ছেলে আব্দার তুলিল,—বাবা, মাইনে—

পিতা ঘুরিয়া পুত্রের গালে প্রকাণ্ড চড় বসাইয়া দিল, বলিল, —স্কুলে যেতে হবে না তোকে, শুয়ার—

পুত্র বিকট চীৎকারে ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। শান্তি আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল,—এমন বাঁদর ছেলে ত, দেখিনি,

কোথাও! মানুষ বেরুচ্ছে, তার পেছনে জ্বালাতন! যা হতভাগা, তোকে আর স্কুলে যেতে হবে না।

তার পর স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—আমি সব ঠিক করে দেব'খন। তোমায় আর এখন ভাবতে হবে না। আপিস যাও। শান্তির চোখ ছল-ছল করিয়া আসিল—গলার স্বর ভারী হইয়া উঠিল।

মনমোহন বলিল,—ভাবব না? কি বল! আজ বিশু এসে বলে গেছে, তার দোকানে তিপ্পান্ন টাকা ধার হয়েছে—দু'চার দিনের মধ্যে দিতে না পারলে সে নালিশ করবে।

শান্তি কহিল,—তার হাতে পায়ে ধরে বলো, বিনির অত বড় অসুখটা গেল, তাতেই ডাক্তারে-ওষুধে বিস্তর খরচ হয়ে গেছে, কাজেই দিতে পারনি! এখন সে সেরেছে, এবার ক্রমে ক্রমে সব ধার শুধে ফেল্‌বে। দেবে না, বলনি ত!

এত দুঃখেও মনমোহন হাসিয়া ফেলিল, কহিল,—তোমার মেয়ের অসুখ বলে পাওনাদার ত চুপ করে থাক্‌তে পারে না। যাক্, ভেবেই বা আর করছি কি! যা বরাতে আছে, হবে।

শান্তি কহিল,—সেই ভাল। বরাত ছাড়া পথ নেই। তুমি আর ভেবো না। ভগবান্ এক রকম করে চালিয়ে দেবেনই।

ছিন্ন ছত্র লইয়া মনমোহন বাহির হইয়া গেল। পথে তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, ভগবান কি দিয়া চালাইবেন! ভগবান কি আছেন? নাইরে, ভগবান নাই—নহিলে সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিয়া সারা হইয়াও সংসারে কোন দিকে এতটুকু শৃঙ্খলা বা সামঞ্জস্য আনিতে পারে না, আর ও পাড়ার দত্ত

বাবুরা এই যে যখন-তখন ঘটা করিয়া বাগানে বাই-নাচ দিয়া রঙীন ফানুস জ্বালাইয়া বাজি পুড়াইয়াও পয়সা ফুরাইতে পারিতেছে না!

মাথার উপর সূর্য্য তখন প্রচণ্ড অনল বর্ষণ করিতেছিল। মনোহরপুকুরের প্রান্ত পার হইয়া বড় রাস্তা ধরিয়া তাহাকে আলিপুরে অফিস করিতে হইবে, এ দীর্ঘ পথ আর অতিক্রম করা যায় না। মনমোহনের জীর্ণ ছত্র সূর্য্যের সে অনলতাপ হইতে তাহার মাথাটাকে রক্ষা করিবে, এমন শক্তি তাহার ছিল না। জুতার একটা পেরেকও এমন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহার পা-টা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে!

কালীঘাটের পুলের কাছে আসিয়া মনমোহন জুতা খুলিয়া একটা ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড লইয়া পেরেকটায় ঘা দিয়া বসাইল। পা তখনও জ্বলিতেছিল। মনমোহন কাঠের রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইবার সময় ছেলেকে মারিয়া মনটা বিশ্রী হইয়াছিল। তার কি দোষ? মাহিনার জন্য স্কুলে তাগাদা করিয়াছে, এই কথাটাই না শুধু সে বলিতে আসিয়াছিল। আহা, বেচারী!

গ্যাছের তলায় স্নিগ্ধ একটু ছায়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল। মনমোহন কপালের ঘাম মুছিয়া ভাবিল, সেইখানে দাঁড়াইয়া একটু জুড়াইয়া লইবে।

পথের উপর দিয়া সদর্পে তখন গাড়ী-জুড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে—পয়সাওয়ালা উকীল-মোক্তার ও মামলাবাজের গাড়ী! আশার উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল তাহাদের চোখ, হাসির কিরণে প্রদীপ্ত মুখ—গাড়ীর মধ্যে বসিয়া হাস্য-কৌতুকের লহর তুলিয়া সব চলিয়াছে! মনমোহনের মনে হইল, এই দারিদ্র্যের আঁধারে ঘেরা পৃথিবীর

বুকের উপর দিয়া আনন্দের একটা বিদ্যুৎ যেন ঠিকরিয়া গেল। পৃথিবীর সকল সুখ, সকল সৌভাগ্য—ইহারা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে! ইহাদের প্রাচুর্য্যের অন্তরালে কি দারুণ দৈন্য পথের কিনারায় পড়িয়া হা-হা করিতেছে, তাহা ইহাদের চোখেও পড়ে না। মনমোহনের বক্ষ-পঞ্জরগুলাকে চূর্ণ করিয়া নৈরাশ্যের এক তীব্র হাহাকার ফুটিয়া উঠিল।

আর দাঁড়াইয়া থাকাও চলে না। অফিসের নূতন বড় বাবু ভারী কড়া লোক, হাজিরার সময়ের এক চুল তফাত হইবার যো নাই—সাহেবের কানে সে সংবাদ পৌঁছিতে তখনই এতটুকু বিলম্ব ঘটিবে না! আর তাহা হইলে এই পঁচিশটি টাকার মূলে—ওঃ! সে কথা ভাবিতেও গা শিহরিয়া উঠে! মনমোহন ছাতা খুলিয়া অফিসের দিকে চলিল।

২

অফিসে গিয়াই সে দেখে, সেখানে আমোদের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কেহ চেয়ার, কেহ খাতা তুলিয়া মহা-আনন্দে কলরব লাগাইয়াছে। বিরিঞ্চি কোমরে চাদর জড়াইয়া সহসা অপূর্ব্ব নৃত্য-কৌশল দেখাইবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সব দেখিয়া শুনিয়া মনমোহনের তাক লাগিয়া গেল। সে ভাবিল, ব্যাপার কি! বড় বাবুর সহসা মৃত্যু ঘটিল না কি! বড় বাবুর প্রতি সকলেরই মন এতখানি প্রসন্ন ছিল যে, এতটা আনন্দের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে মন ঐ বিষয়টার প্রতিই প্রথম ইঙ্গিত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না।

মনমোহনকে আসিতে দেখিয়া শৈলেন চীৎকার করিয়া উঠিল,—বাজিমাৎ হে, মনু—

মনমোহন সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করিল,—কি? হয়েছে কি?

কালিদাস কহিল,—ফলার পেকেছে।

তাহার মুখের কথা লুফিয়া গণেশ কহিল,—আমাদের বগলা ডার্বির টিকিট কিনেছিল—আজ খবর এসেছে, ওর নামে একটা ঘোড়া উঠেছে। ও পাঁচশ' টাকা পাবে। তারা মনি-অর্ডার অবধি করেছে।

মনমোহনের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। বগলা—! চিরকেলে বখা বগলা! বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্রের দারুণ রোগের সময়ও বাড়ীতে যাহার চুলের টিকি দেখিতে পাওয়া যায় না—অফিসের ছুটীর অন্তরালে চরিত্রহীনা নারীর সংসর্গে নেশা-ভাঙ করিয়াই যাহার সময় কাটে—সেই দায়িত্ব-জ্ঞান-হীন ইয়ার বগলার অদৃষ্টে এত টাকা! তাও গতর খাটাইয়া নয়,—নিতান্তই ফাঁকতালে! আর মনমোহন?

সে ভাবিল, ইহার পরও মানুষ বলিবে, এটা ভগবানের রাজ্য—বিচার এখানে নিক্তির ওজনে বাঁটিয়া দেওয়া হয়! মিথ্যা কথা!

প্রথমটা তাহার মুখে কোন কথা জোগাইল না। অফিসের বন্ধুদের সহিত এ আনন্দে নির্লজ্জভাবে যোগ দিতে তাহার কেমন সঙ্কোচ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই বগলার প্রতি একটা শ্রদ্ধায় মন তাহার ভরিয়া উঠিল। ভাগ্যবান্ বগলা! লক্ষ্মীকে সে যত ছাড়িয়া থাকিতে চায়, লক্ষ্মী ততই তাহাকে কোলে টানিয়া লয়! এই সে দিন সাহেবের একটা বিশেষ প্রিয় কার্য্য করিয়া দিয়া সে অফিসে প্রোমোশন সংগ্রহ করিয়াছে—তাহার কার্য্যতৎপরতায়

সাহেব তাহার প্রতি বিশেষ তুষ্ট, বড়বাবুও তাহাকে ঠেলিয়া চলিতে পারেন না। অথচ মনমোহন—তাহার মত সাধু কর্ম্মনিষ্ঠ কেরাণী অফিসে আর দুটি নাই! কিন্তু তাহার অদৃষ্টচক্রটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও লক্ষ্মীর প্রাসাদ-ভবনের দিকে এতটুকুও অগ্রসর হইতে পারে না! কেন, কেন, কি পাপে তাহার পানে চপলা লক্ষ্মী একটা নিমেষ-কটাক্ষও পাত করেন না?

টিফিনের ছুটীর সময় বগলা সেদিন সকলকে নানাবিধ সরস ভোজ্যে আপ্যায়িত করিল। কোনমতে তাহাকে একান্তে পাইয়া মনমোহন প্রশ্ন করিল,—কত টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছিলে?

বগলা কহিল,—দশ টাকা। পরে হাসিয়া বলিল,—এক বেটা সাহেব এসে ধরেছিল, একখানা টিকিট নিতে হবে। কখনও নিই নি—একেবারে দশ-দশটা টাকা! বার করে দিতে কেমন মায়া হল। সে বেটাও নাছোড়বন্দা—কাজেই শেষে ভাবলুম, দূর হোক্‌গে, এতদিকে এত বাজে পয়সা খরচ হচ্ছে, দি ফেলে দশটা টাকা। দিলুম। শেষ দেখি, লাগ্‌বি ত লাগ্‌ একদম পাঁচশ টাকা সেই টিকিটে! নম্‌-ডি-প্লুম্ দিয়েছিলুম—জয়-মা-কালী। টাকাটা পেলেই আগে কালীঘাটে পাঁচ টাকার পুজো পাঠিয়ে দেব।

৩

ইহার পর দুই-চারিদিন ধরিয়া মনমোহনের চিত্ত নিতান্তই অধীরভাবে নিজের ভবিষ্যৎটাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। নাই, উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। আলিপুরের এই আর্মি-ক্লোদিং

অফিসে সে সামান্য কেরাণীর কাজ করে—এ চাকরিতে কতই বা উন্নতি হইবে! বড় জোর মাসে চল্লিশটা টাকা! কিন্তু এতগুলা লোককে ডিঙ্গাইয়া সহসা তাহার মাহিনা বাড়িবে কি করিয়া? ইহারা যদি মরিয়া যায়! কিন্তু তাহার উপরে আছে চার জন কেরাণী; সকলেই মরিয়া যাইবে—এ হইতেই পারে না! তাহার চেয়ে মনমোহনের মৃত্যুই ত বেশী সম্ভব! কাজেই যে পঁচিশ, সেই পঁচিশেই তাহাকে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে! হায়, ছেলেবেলায় অনর্থক কতকগুলা বদ সঙ্গীর-দলে মিশিয়া স্কুল পলাইয়া লেখাপড়ায় অবহেলা যদি সে না করিত! ঐ ত বিনোদ, সত্য স্কুলে তাহারই সহপাঠী ছিল। এখন তাহাদের কেহ উকীল হইয়াছে, কেহ বা হাকিম। আর সে? বেচারা, নিতান্তই বেচারা সে! তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল। হায়রে, স্কুলে পড়িবার সময় এই বিনোদ, সত্য এবং তাহার মধ্যে এতটুকু ব্যবধান ছিল না, এক বেঞ্চে সকলে বসিত। এখন আর সে অধিকার নাই! লক্ষ্মীছাড়া সে, সামান্য পঁচিশ টাকার কেরাণী, আর তাহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র! তাহার জীবনে যে আঁধার, সেই আঁধারই রহিয়া গেল। ভবিষ্যতেই বা আলোর সম্ভাবনা কৈ?

তখনই আর একটা কথা মনে পড়িল। অমনি তাহার আঁধার চিত্তের মধ্যে মৃত্যুপথ-যাত্রী রোগীর মুখে ম্লান হাসির মতই আশার ক্ষীণ বিদ্যুৎরেখা খেলিয়া গেল! সে ভাবিল, চপলা লক্ষ্মীকে বাঁধিবার এখন শুধু একটি উপায় আছে—একটিমাত্র উপায়! সে উপায়, দশটি টাকা দিয়া ডার্বির টিকিট কেনা। ঐ ত বাঁশলা! কেমন ধাঁ করিয়া দশ টাকা ব্যয় করিয়া পাঁচশ' টাকা ঘরে

আনিল। বগলার প্রতি তাহার মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। মনমোহন হাতের কলম নামাইয়া রাখিয়া বাহিরের পানে চাহিল।

বাহিরে বগলার কণ্ঠস্বর শুনা গেল। বেশ প্রসন্ন, প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর! কেন না হইবে? না চাহিতেই মা লক্ষ্মী যাহার পকেটে নোটের তাড়া গুঁজিয়া দেন, তাহার স্বর যদি প্রসন্ন না হয় ত কাহার হইবে? কি অবিচার! মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মুখে রক্ত উঠাইয়া কায়ক্লেশে সে ঐ পঁচিশটি মাত্র টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, সে টাকায় তাহার স্ত্রী, তাহার পুত্র—সকলের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, জীবন নির্ভর করিতেছে—একটি পয়সা অপব্যয় নাই—বিলাস কাহাকে বলে, সে তা জানেও না, শান্ত সংযত জীবন বহন করিতেছে—অথচ তাহাকে উপেক্ষা করিয়া ভাগ্যলক্ষ্মী নিতান্তই অপব্যয়ী দায়িত্ব-জ্ঞানহীন ঐ বগলার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন! মনমোহনের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নাইরে, কোন উপায় নাই! এমন নৈরাশ্যের হাহাকার বুকে পূরিয়া জীবনটাকে বহিয়া কি লাভ! তাহার চেয়ে এখনই ঐ চাদরের ফাঁস গলায় টানিয়া মৃত্যু—লক্ষগুণে ভাল!

মনমোহনের মাথায় খুন চাপিল। তাহার মনে হইল, আর এ ব্যর্থ জীবনটাকে টানিয়া বেড়াইয়া কোন লাভ নাই! যে-পুরুষ উপার্জ্জন করিতে পারিল না, স্ত্রী-পুত্রকে পেট ভরিয়া দুই মুঠা খাইতে দিবার যাহার সামর্থ্য হইল না,—সে আবার পুরুষ! কি বলিয়া লোকের মাঝে সে মাথা তুলিয়া বেড়ায়, হাসে, গল্প করে? নির্লজ্জ কাপুরুষ! পৃথিবীর ভার সে! তার মরাই উচিত!

মনমোহন চাদরখানা গলায় তুলিয়া লইল—একটা ফাঁস টানিল। তাহার চোখের সম্মুখে মহাকাল যেন সহসা পিঙ্গল জটাভার মুক্ত করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তখনই স্ত্রী-পুত্রের কথা মনে পড়িল। এ মৃত্যু সেই স্ত্রী-পুত্রের মুখ হইতে এই পঁচিশটি টাকার গ্রাসও কাড়িয়া লইবে! মরিয়া সে ভাবনার দায় এড়াইবে বটে, কিন্তু—শান্তি? ছেলেমেয়েরা? তাহাদের দশা কি হইবে? তাহারা এ ক্ষুদ্র আশ্রয়টুকুও হারাইয়া একেবারে পথে বসিবে যে!

মনমোহনের মরা হইল না। ভিতরের ঘরে রুদ্ধ বাতাস তাহার বুকের উপর পাথরের মতই চাপিয়া বসিয়াছিল। সে বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িল। বড় বড় গাছগুলা অনেকখানি ছায়া বিস্তার করিয়াছিল, মৃদু স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছিল। মনমোহন আসিয়া বাহিরে একটা গাছতলায় দাঁড়াইল। দূরে পথে হেলিয়া দুলিয়া লোক চলিয়াছে, অদূরে কাছারির প্রাঙ্গণে কত লোক ঘুরিতেছে, গল্প করিতেছে। মনমোহন ভাবিল, ইহারা কত সুখী! প্রাচুর্য্যের মধ্যে এমন করিয়া কাহাকেও হাহাকার করিয়া ফিরিতে হয় না! ঐ যে আসামীটাকে পাহারাওয়ালারা দস্তুরমত দড়ি বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে, ও আসামীটাও অন্নের চিন্তায় এতখানি কাতর নয়, বেশ ত হাসিতেছে! জগতে সকলেই সুখী, সকলের মুখেই হাসির ছটা! সে—সে-ই শুধু অভাব আর নৈরাশ্যের আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক্ হইতেছে।

বগলা আর-দু'জন বন্ধুর সহিত গল্প করিতে করিতে তাহারই কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা সিগারেট লইয়া কহিল,—এই নাও হে মনু।

মনমোহন অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিল,—সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি।

—এঁ্যা—সে কি হে! বলিয়া তাহার পানে একটা সবিস্ময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বগলা চলিয়া যাইতেছিল, মনমোহন তাহাকে ডাকিল,—বগলা—

—ডাকছ? বলিয়া বগলা ফিরিল। বন্ধুদ্বয় চলিয়া গেল।

মনমোহন কহিল,—আমায় একটা ডার্বির টিকিট কিনে দেবে? আমি দশটা টাকা দেব।

বগলা হাসিয়া কহিল,—সে ত এখন প্রায় দশ মাস পরে বিক্রী হবে। তা যা বল্‌ছ, এ মন্দ নয়, মনু। কি জানো, বছরে দশটা করে টাকা ফেলে দেওয়া শুধু—যদি বরাতে লাগে ত দু'চার লাখও লেগে যেতে পারে!

দু'চার লাখ! মনমোহনের মনে হইল, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা আগাগোড়া যেন কে নোটে-টাকায় মুড়িয়া দিয়াছে! দশ টাকা ব্যয় করিয়া দুই-চার লাখ পাইবারও সম্ভাবনা আছে! এ যে পাগলের কথা!

কিন্তু না, পাগ্‌লামি নয়! বগলা পকেট হইতে একটা ছাপানো কাগজ বাহির করিয়া দেখাইল, এই বৎসরেই মান্দ্রাজের কে-একজন বিষ্ণুস্বামী পিলে দশ টাকার টিকিট কিনিয়া লাখ টাকা পাইয়াছে। তাহার ঘোড়াই ডার্বি জিতিয়াছে! তবে! সেই বা কেন না পাইবে? মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতার মনোহরপুকুর কতদূরই বা! আর এই বিষ্ণুস্বামী পিলে—কে জানে, এও হয় ত কোন রকমে তাহারই মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কায়ক্লেশে কিছু উপার্জ্জন করিয়া স্ত্রী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন করিতেছিল! লক্ষ্মী তাঁহার

তর্জ্জনীর একটা ইঙ্গিতে এই ডার্বির ঘোড়া উপলক্ষ করিয়া তাহার হাতে পাঁচ লক্ষ টাকা তুলিয়া দিয়াছেন! তবে? তাহার অদৃষ্টেই বা না মিলিবে কেন?

সাহস চাই! সাহস! এই দশটা টাকা ব্যয় করিবার সাহস এবং শক্তিও। পয়সার জন্য পৃথিবীতে কত লোক কত দুঃসাহসিক কাজ করিতেছে, বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া দেশ-দেশান্তরে ছুটিতেছে! উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মীঃ! সে এতখানি জীবনে কি করিয়াছে—কি দুঃসাহস, কি অধ্যবসায় দেখাইয়াছে যে, ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা-কটাক্ষের দাবী সে করিতে পারে? সত্যই ত, পয়সার জন্য মানুষ কি না করিতেছে! এরোপ্লেনে উড়িতেছে, খনির ভিতর নামিতেছে—তবে না লক্ষ্মী অজস্রধারে তাহাদের শিরে মণি-মাণিক্য বর্ষণ করিতেছেন! চাই উদ্যম। চাই সাহস! এই সব চাই। সে-ও এইবার সাহস করিয়া, ভরসা করিয়া এই দশটা টাকা—দশটা টাকামাত্র ব্যয় করিবেই। বিষ্ণুস্বামী পিলে দশ টাকা ব্যয় করিয়াছিল, তাই সে আজ পাঁচ লক্ষ টাকার মালিক। সে-ও যদি সাহস করে, তবে হয় ত তাহার দাবী'ও উপেক্ষিত হইবে না!

কিন্তু এই দশটি টাকা সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কতখানি কঠিন! নিজের ও স্ত্রী-পুত্রের আহারের অংশ ছিনাইয়া সে টাকার জোগাড় করিতে হইবে! উপায় নাই, ছিনাইতেই হইবে! কষ্ট হইবে। কিন্তু এ কষ্ট না করিলে সুখ-সৌভাগ্য আয়ত্ত হইবে কেন? কষ্ট করিয়া দশটা টাকা দিলে যখন পাঁচ লাখ ঘরে আসিবে, তখন? তখন যে আর এমন ভাবে খাটিয়া মরিতে হইবে না—ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে ডুবিয়া থাকিবে

সে! মনমোহনের চোখের সম্মুখে মুহূর্ত্তে আশার এক উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিল। প্রকাণ্ড প্রাসাদ, প্রচুর অর্থ, অসংখ্য লোকজন—ঐশ্বর্য্যের এক বিপুল সমারোহ! আঃ, এতদিনে দুঃখ ঘুচিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। স্ত্রী-পুত্রকে আর অভাব-হাহাকারের মধ্যে জর্জ্জরিত হইতে হইবে না!

মনমোহন বগলাকে কহিল,—এবার যখন ডার্বির টিকিট বেচতে আস্‌বে, আমায় বলো। আমি একখানা কিন্‌ব।

বগলা কহিল,—আচ্ছা।

সে মাসে মাহিনা পাইয়া মনমোহন যখন শান্তির হাতে চব্বিশটি টাকা দিল, তখন শান্তি কহিল,—এক টাকা কম যে?

একটা ঢোক গিলিয়া মনমোহন উত্তর দিল,—আপিসে কিছু খাব বলে একটা টাকা কাছে রেখেচি। না খেলে বড় কষ্ট হয়!

শুনিয়া শান্তি আর কিছু বলিল না। না বলুক, মনমোহনের মনে হইল, আজ সে ভয়ানক একটা অন্যায় কাজ করিয়াছে। স্ত্রী ও আপনার মধ্যে এতদিন কোথাও সে এতটুকু গোপনতা রাখে নাই—আজ এই প্রথম! কথাটা বলিয়া অবধি তাহার মন জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সব কথা খুলিয়া বলিবে কি? কিন্তু না, থাক্! এখন বলিয়া কাজ নাই, এতটুকু আভাষ দিবারও প্রয়োজন নাই! মনমোহন পূর্ব্ব হইতেই সব ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। একটা টাকা কাটিয়া রাখিলে অসুবিধা সম্ভব! পঁচিশ টাকাতেও ত টানাটানি করিয়া সংসারের কোন দিকে সামঞ্জস্য আনা যায় না—তাহার উপর এক টাকা

কম পড়িলে কষ্ট বাড়িবে বৈ কমিবে না। কিন্তু উপায় নাই! এ কষ্ট সহিতেই হইবে। তবে আর-কাহারও উপর সে এ কষ্টের ভার চাপাইবে না, এ কষ্ট সে নিজেই সহিবে। রাত্রে সে আহার করিবে না—তাহা হইলেই ত সব গোল মিটিয়া যায়। সংসারে ইহাতে খরচও বরং কিছু কমিতে পারে।

মনমোহন পয়সা জমাইতে মন দিল। সন্ধ্যার পর মাথা একটু ধরিতে থাকে—বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিয়া মাথার সে যন্ত্রণা নীরবে সে সহ্য করে। শান্তি আসিয়া কত মিনতি করে,—নিত্যি এমন খিদে নেই বলে পড়ে থাকচ—এ ত ভাল কথা নয়। ডাক্তারকে বলে একটা ওষুধ-বিষুধ খাও, না হলে বাঁচ্‌বে কেন?

মনমোহন সে কথার জবাব দেয় না। সে ভাবে, এ কষ্ট ক'দিনের জন্যই বা! আর এই ক'টা মাস! তার পর ডার্বির ঘোড়ার পিঠে চাপিয়া পাঁচ লক্ষ টাকার থলি আসিয়া যখন ঘরে পৌঁছিবে, তখন এ কষ্ট, এ যন্ত্রণা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ হইবে!

পূজার সময় ছেলেরা আসিয়া নূতন কাপড়ের জন্য আবদার ধরিলে মনমোহন গর্জ্জিয়া উঠিল,—দুদিন তর্‌ সয় না? এবার ভাল কাপড়-চোপড় বাজারে কিছু আসেনি। সেই বড়দিনের পর খুব ভাল পোষাক করে দেব'খন।

বাপের কথা শুনিয়া ছেলেরা মুষড়াইয়া গেল, মার কাছে গিয়া ক্ষুব্ধ বেদনার বেগ ছাড়িল। মা হাসিয়া কহিল,—তোরা চুপ কর্‌ দিকি, আমি সে বল্‌ব'খন।

ষষ্ঠীর দিন ছেলেরা নূতন কাপড় পরিয়া ও-পাড়ায় ঠাকুর

দেখিতে গিয়াছিল। তাহারা বাড়ী ফিরিলে মনমোহন কহিল,—এ কাপড় কে দিলে রে তোদের ?

ছোট ছেলে রামমোহন কহিল,—মা কিনে দিয়েছে।

মনমোহন আসিয়া শান্তিকে জিজ্ঞাস করিল,—এদের কাপড় কি তুমি কিনে দিয়েছ ?

শান্তি রান্নাঘরে ঝোল চড়াইয়া দাঁলানে বসিয়া নৈবেদ্য সাজাইতেছিল। পাড়ায় পূজার বাড়ীতে প্রতি বৎসরই পূজার কয়দিন সে একখানি করিয়া ছোট নৈবেদ্য পাঠাইত। স্বামীর কথায় কহিল,—হ্যাঁ। আহা, বছরকার দিনে একখানা নতুন কাপড় পরবে না ?

মনমোহন কহিল,—পয়সা পেলে কোথায় ?

শান্তি কহিল,—সেদিন রায়েদের বাড়ী আমায় সধবা করেছিল—তারা একখানা নতুন কাপড় আর দুটো টাকা দিয়েছিল, সেই টাকা আর ঘর থেকে কিছু দিয়ে কিনে দিয়েছি।

মনমোহন কহিল,—ঘরে টাকা পেলে কোথায় ?

শান্তি তাহার দুই ডাগর চোখের ছলছল দৃষ্টি লইয়া মনমোহনের পানে চাহিল। মনমোহন কহিল,—বল, শান্তি।

শান্তস্বরে শান্তি কহিল,—রাত্রে ত আমি খাই না—খরচ তাই কম হচ্ছে।

—শান্তি—

মনমোহন কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া শান্তি বলিল,—তুমি যে এই না খেয়ে থাকচ ! তুমিও রাত্রে কিছু খাওনা যে ! আর আমায় কি এমন খিদে—

মনমোহন বলিল,—আমার অসুখ হয়, তাই খাই না। বেশ,

এবার থেকে খাব'খন। পরে একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া মনমোহন আবার বলিল,—কেন খাই না, জানো শান্তি? আমি দশ টাকা খরচ করে ডার্বির টিকিট কিনবো।

—সে কি?

মনমোহন তখন সব কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া শান্তি বলিল,—এই! এর জন্যে তুমি রাত্রে খাওয়া ছেড়ে দেছ! আচ্ছা, তোমায় আর উপোস করতে হবে না। তুমি এবার থেকে খেয়ো,—না হলে খাটুনির শরীর, সহ্য হবে কেন? তোমার টিকিটের ব্যবস্থা আমি করবো'খন।

—কি করে করবে?

—সে দেখো তখন। সংসার চালাতে হয় কি করে, তা আমরা মেয়েমানুষ খুব বুঝি। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থেকো।

মনমোহন আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

৪

অফিস হইতে ডার্বির টিকিট কিনিয়া সন্ধ্যার সময় মনমোহন যখন ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল,—শান্তি—শান্তি তখন মাথার যন্ত্রণায় কাতর হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। তাহার চোখে কে যেন লঙ্কা গুঁজিয়া দিয়াছে। চোখ এমনি জ্বালা করিতেছিল—তাহার উপর মাথাও যেন একেবারে যাতনায় খসিয়া যাইতেছিল, মাথা তুলিবার শক্তি ছিল না। শান্তিকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া মনমোহন চমকিয়া উঠিল। এতদিন একসঙ্গে ঘর করিতেছে, কৈ, কখনো ত এমন অবেলায় তাহাকে সে শুইতে দেখে নাই।

মনমোহন বলিল,—আজ টিকিট এনেছি।

শান্তি বলিল,—রেখে দাও সাবধানে।

ডার্বির টিকিট বাক্সে বন্ধ করিয়া শান্তির কাছে আসিয়া সে ডাকিল,—শান্তি—

—উ! শান্তি আর কিছু বলিতে পারিল না, চোখও খুলিল না। মনমোহন তাহার কপালে হাত দিল। উঃ, এ যে আগুন! হাত যেন পুড়িয়া গেল। বলিল,—তোমার যে খুব জ্বর হয়েছে, শান্তি!

অতি কষ্টে শান্তি চোখ চাহিল। বলিল,—হ্যাঁ, তাকের ওপর সন্দেশ আছে, নিয়ে খাও। জল এক গ্লাস গড়িয়েই নিয়ো। আমি মাথা তুলতে পারছি না।

—ছেলেরা কোথায়?

—তারা ভাবিনীদের বাড়ী গেছে। ওদের ওখানেই চালডাল পাঠিয়ে দিছি, খেয়ে আস্‌বে তারা। তোমার ভাত ওদের বামুন দিয়ে যাবে।

মনমোহন গামছাখানা ভিজাইয়া শান্তির কপালে টিপিয়া ধরিল। শান্তি একটু আরাম পাইয়া বলিল,—আঃ!

তার পর অনেকক্ষণ আর কাহারো মুখে কোন কথা ফুটিল না। শান্তি জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মনমোহন একবার ব্যাপারটা আগাগোড়া তলাইয়া দেখিতেছিল। শান্তির এই জ্বর—রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত চাই। তাহার উপর রোগীর সেবা,—ঔষধ চাই, ডাক্তার চাই। কি করিয়া সে ভাল হইবে? আঃ,—ভাবনার কি অন্ত আছে! কি বিষম দুর্ভাগ্য লইয়াই সে জন্মিয়াছিল রে!

পাশ ফিরিয়া শান্তি কহিল,—খাবার খেলে?

—খাচ্ছি। বলিয়া মনমোহন আবার চুপ করিয়া রহিল। নিস্তব্ধ ঘর বিভীষিকায় ভরিয়া উঠিতেছিল। দারুণ অস্বচ্ছন্দতায় মনমোহনের চিত্ত অবশ ও কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। সে একা, নেহাৎ বেচারা, কি করিয়া কোন্ দিক এখন সামলাইবে!

শান্তি তাহার রোগ-তপ্ত হাত দুইটা স্বামীর কোলে বিছাইয়া দিল, মাথাটাও মনমোহনের হাঁটুর কাছে সরাইয়া আনিল, বলিল, —যাও না গা—মুখ-হাত ধোও না—

—কখন্ জ্বর হলো, শান্তি? কৈ, ও-বেলায় ত কিছু বলনি।

—বলে কি হবে? জ্বর হয়েছে আজ দু'দিন। উপোষ দিচ্ছিলুম, চেপেচুপে রেখেছিলুম। ভেবেছিলুম, উপোষ দিলেই সেরে উঠব্। আজ রান্না কর্‌তে বসে আর পার্‌লুম না। কোনমতে ছেলেদের খাইয়ে-দাইয়ে হেঁসেল পেড়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়েচি। হুঁস ছিল না। ভাবিনীর মা বেড়াতে এসেছিলেন—তিনি এই একটু আগে গেলেন। তাঁর হাতে-পায়ে ধরে তোমাদের এবেলার খাবার ব্যবস্থা করেছি।

মনমোহন কোন কথা বলিল না, একদৃষ্টে পত্নীর জ্বর-পীড়িত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। শান্তির সমস্ত মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। জ্বরের ঝাঁজে দুই গাল একেবারে টক্‌টক্ করিতেছে! কি করিয়া শান্তি ভাল হইবে! সে যে বড় আশায় ডার্বির টিকিট কিনিয়াছে—দশ টাকা খরচ করিয়া। এই অসুখটা আর দুই মাস পরে হইলে ত কোন ভাবনা থাকিত না—তখন দুই-চারি লাখ টাকার মালিক সে—মুখের কথা খসাইতে না খসাইতে বাড়ীতে ডাক্তারের ভিড় জমিয়া যাইত। দেখিবার শুনিবার, সেবা করিবার লোকেরও কি অভাব থাকিত! আর

এখন? হায় রে কপাল! অস্বস্তির জ্বালায় মনমোহনের প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল।

শান্তি বলিল,—খেলে না? কি ভাবচ?

মনমোহন বলিল,—এত জ্বর তোমার, একজন ডাক্তার চাই ত। কিন্তু কাকে ডাকি?

মৃদু হাসিয়া শান্তি বলিল,—পাগল হয়েছ তুমি! ডাক্তারে কি হবে? এ আপনিই সেরে যাবে'খন! তবে ক'দিন তোমার কষ্ট হবে—এই যা ভাবনা!

মনমোহন বলিল,—না, ডাক্তার একজন চাই বৈ কি শান্তি। এত জ্বর!

—তুমি পাগল হয়েচ! কথাটা বলিয়া শান্তি এমন এক দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিল যে, মনমোহনের বুক ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। নৈরাশ্যে সমস্ত গা দুলিয়া উঠিল।

শান্তি কহিল,—ভয় নেই, আমি মর্‌বো না। আমি মলে তোমার বড় কষ্ট হবে। এ সব ঝক্কি তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে মর্‌তে আমি পারি কখনো?

শীতের প্রভাতে একটু নাড়া পাইলে গাছের পাতা হইতে ঝর-ঝর করিয়া যেমন শিশিরবিন্দু ঝরিয়া পড়ে, শান্তির কথার ঘায় মনমোহনের দুই আঁখির পাতা হইতে ঝরঝর করিয়া তেমনি অশ্রুর বিন্দু ঝরিয়া পড়িল।

সারারাত্রি সে দিন মনমোহনের বুকে একখানা ভারী পাথর যেন আঁটিয়া বসিয়া রহিল। শান্তির অসুখ,—ডাক্তার, ঔষধ, পয়সা, নানা চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত কাতর বেচারা শেষ রাত্রে কখন্ যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে বুঝিতেও পারিল না। যখন ঘুম ভাঙ্গিল,

তখন ঘরে রৌদ্র আসিয়াছে—শান্তি ঘরের বাহিরে কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে। মনমোহন উঠিয়া গিয়া দেখিল, ভাবিনীদের বাড়ীর ঝী!

শান্তি বলিল,—ভাবিনীর মা সাবু পাঠিয়েছেন। তোমাদের দু'বেলাই আজ ওখানে খাবার কথা বলে দিয়েছেন।

ঝী চলিয়া গেলে শান্তি ঘরে আসিয়া বসিল। মনমোহন তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিল,—জ্বরটা কম আছে এখন, না?

শান্তি স্বামীর পানে চাহিল,—সে মুখে কি উদ্বেগই না ফুটিয়াছে! আহা! শান্তি বলিল,—হাঁ।

মনমোহন বলিল, —কার কাছে যাই, বল দেখি?

—তার মানে? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শান্তি মনমোহনের পানে চাহিল।

মনমোহন বলিল,—কোন্ ডাক্তারকে ডাকি?

শান্তি বলিল,—তুমি পাগল করবে, দেখ্‌চি। কাকেও ডাক্‌তে হবে না গো—এম্‌নি সেরে যাবে'খন। এই ত আজ অনেকটা ভালো আছি। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে আপিস যাও।

মনমোহন ভাবিতেছিল, আহা, তাই হোক্!...কিন্তু যদি না সারে? কি করা যায়! ডাক্তার ডাকিবে? এখনই কতকগুলা টাকা ব্যয় হইবে! অনর্থক ব্যয়! অথচ এতগুলা টাকা আসে কোথা হইতে? জ্বর কি মানুষের হয় না? সারেও ত! ডাক্তার ডাকিলেই যদি রোগ সারিত, তাহা হইলে—তাহা হইলে ঐ ত মিত্তিরদের বড় বাবু—মাথা ধরিলেই সাহেব ডাক্তার আনাইত যে—তিন দিনের মধ্যে মরিয়া যাইবে কেন? সাত-আটটা ডাক্তার দিবারাত্র অমনি মাথার কাছে বসিয়া ছিল—চব্বিশ ঘণ্টা!

তবে আর গরীব-গুর্ব্বোর দল এককোঁটা ঔষধ মুখে না দিয়াও সারিয়া উঠে কি করিয়া!

তবু আপিস যাইবার সময় বুকটা কেবলি ধক্ ধক্ করিতেছিল—শান্তির কথা না মানিয়া ডাক্তার ডাকিলেই ভাল ছিল। কি জানি! কিন্তু এখন বেলা হইয়া গিয়াছে। অনেক বেলা। এত বেলায় ভালো ডাক্তার পাওয়া যাইবে কি?

আপিসে গিয়া কাজ-কর্ম্মে তেমন মন লাগিল না—এক-একবার কি এক অজানা ভয়ে শিহরিয়া সে দুই হাতে মাথা গুঁজিয়া পড়ে, অমনি আবার চকিতে আশার আলোয় চারিধার রাঙিয়া উঠে! দুইটা, দুইটা মাস শুধু। তারপর শান্তিকে লইয়া, ছেলেমেয়েদের লইয়া সে পশ্চিমে চলিয়া যাইবে—দুই মাস, তিন মাস, চার মাস সেখানে থাকিবে! চার লাখ টাকা—দার্জ্জিলিঙে একটা বাড়ী এ টাকায় অনায়াসে কেনা যাইতে পারে। না হয় ভাড়া! কতই বা খরচ! দার্জ্জিলিঙের হাওয়ায় শান্তির এই শীর্ণ-জীর্ণ স্বাস্থ্য একেবারে সারিয়া উঠিবে!

সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়া মনমোহন দেখিল, শান্তির গা গরম—তবে অল্প ঘাম হইতেছে। শান্তি বলিল,—দুপুরবেলায় জ্বরটা বেড়েছিল—এখন আবার ছাড়্‌চে।

ঘাম দেখিয়া মনমোহন একটু ঠাণ্ডা হইল।

রাত্রে—তখন বোধ হয় একটা কি দুইটা,—শান্তির ঘুমন্ত হাতটা গায়ে পড়িতে মনমোহনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। গা পুড়িয়া যাইতেছে—খুব জ্বর! মনমোহন ধড়মড়িয়া উঠিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে বসিল। রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া কত বিচিত্র শব্দ-তরঙ্গ উঠিতেছিল। কত ছবি

বিভীষিকার ঘূর্ণি তুলিয়া চারিধারে নৃত্য করিতেছিল। মনমোহন স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উপায় নাই রে, উপায় নাই! সে কপর্দ্দক-হীন—দুইটা টাকা ঘরে নাই, যাহার জোরে সে একটা যা-তা ডাক্তারকেও ডাকিয়া আনিতে পারে।

ভোরের দিকে শান্তির জ্বর ছাড়িল। সকালবেলায় সে বেশ মাথা ঝাড়িয়া উঠিল—রান্নাঘরে গিয়া ভাতে-ভাত রাঁধিয়া দিল। মনমোহনের সতর্ক সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

সে দিনটা ভালই গেল। সন্ধ্যার দিকেও জ্বর আসিল না; রাত্রেও না। মনমোহন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য।

তিন দিন পরে জ্বর আরো ভীষণ মূর্ত্তি লইয়া শান্তিকে চাপিয়া ধরিল। মাথায় যন্ত্রণা—নিশ্বাস ফেলিতে বুকে ব্যথা লাগে, সর্ব্বাঙ্গে পাকা ফোড়ার মত বেদনা। মনমোহন পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া ডাক্তার আনিল,—ডাক্তার আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগীকে দেখিয়া গম্ভীর মুখে প্রেসক্রিপসন লিখিয়া দিলেন। মনমোহন কম্পিত কণ্ঠে কহিল,—সারবে ত?

ডাক্তার গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—বলতে পারি না। শরীরে এতটুকু রক্ত নেই।

মনমোহন প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। ডাক্তার বলিলেন,—গোড়ায় খুবই অবহেলা করেছেন। নিউমোনিয়া—দুটো দিকই খারাপ।

৫

একগাদা ঔষধ লইয়া আসিয়া মনমোহন অবহেলার প্রায়শ্চিত্তে মন দিল। তাহার এক-একবার মনে হইতেছিল, ছুটিয়া গিয়া ঐ বগলার মাথায় প্রচণ্ড একটা ঘুষি বসাইয়া দেয়। তাহার এ ছোট নীড়টুকুতে সে-ই ত দুরাশার প্রলয় ঝড় বহাইয়া সেটাকে আজ নষ্ট করিয়া দিল। না খাইয়াই বেচারী শান্তির এই রোগ। আজ সাত-আট মাস শান্তি রাত্রির আহার ছাড়িয়া দিয়াছে! মাসের অর্দ্ধেক দিন কেন খাইয়াই কাটাইয়াছে। এমনি করিয়াই তাহার সংসারের ফাঁক সে প্রাণপণে বুজাইয়া আসিয়াছে। ছেলেদের নূতন কাপড় জামা, স্কুলের মাহিনা, সব সে জোগাইয়া আসিয়াছে, ওরে, নিজের বুকের রক্ত দিয়া! কোথা দিয়া কি করিয়া সংসার চলিতেছে, সে কি তার কোন খোঁজ লইয়াছে, কোন দিন? লাখ টাকার নেশায় সে বিভোর হইয়াছিল যে! আজ তাই—

ঐ ডার্বির টিকিট! কি অশুভক্ষণেই যে এ বাতিক ভূতের মত তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছিল!

*   *   *   *

আজ তিন মাস শান্তি রোগে ভুগিতেছে। ক্ষীণ দেহ দিন-দিন শুকাইতেছে।

সেদিন সকালে বগলা আসিয়া ডাকিল,—মনু—

মনমোহন বাহিরে আসিল। বগলা বলিল,—থ্রী চিয়ার্স! তোর নামে ঘোড়া উঠেছে—ও ঘোড়া ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড না হয়ে যায় না! মেরিগোল্ড—মেরিগোল্ড—ডিউক্ অফ্ টাস্কানির মেরিগোল্ড—আরবারে ফার্ষ্ট প্রাইজ নেছে!

মেঘান্ধকারে বিদ্যুতের আলো ফুটিলে পথিক যদি চাহিয়া দেখে, সে তাহার গৃহের দ্বারেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে,—তাহা হইলে সে যেমন আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়ে, এই ঘোর বিপদের মধ্যে এ-সংবাদে মনমোহনের প্রাণটাও তেমনি আনন্দে নাচিয়া উঠিল। কূল মিলিয়াছে রে, কূল মিলিয়াছে! আর ভয় নাই!

শান্তি এ যাত্রা বাঁচিবে, বাঁচিবে! টাকাটা হাতে একবার পাইলে হয়, তাহা হইলে তখনই ইন্‌ভ্যালিড্‌ সেলুন রিজার্ভ করিয়া সে ওয়াল্‌টেয়ারে, নয় আলমোরায়, নয় আর কোথাও শান্তিকে সেই দণ্ডে লইয়া যাইবে। যক্ষ্মারোগীর পক্ষে ঐ জায়গা দুইটা আশ্চর্য্য রকমের স্বাস্থ্য-নিবাস।

* * * *

রাত্রে শান্তি ঘুমাইতেছিল। ঠিকা দাসী শিবুর মা শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল। মনমোহন বাহিরে আসিল। জ্যোৎস্না যেন গভীর আনন্দে পৃথিবীর গায়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। আলোয়-আলোয় চারিধার ভরপুর! মনমোহন তাক্‌ হাতড়াইয়া কতদিনকার পুরাতন টাইম-টেব্‌ল্‌ লইয়া ঘরে ঢুকিল। প্রদীপের আলোয় পাতা ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া কাগজে হিসাবের অঙ্ক ফেলিল—সঙ্গে কোন্‌ ডাক্তার যাইবে, ক'জন নার্শ, কত খরচ হইবে, তাহার একেবারে পাকা রকমের ফর্দ্দ পাড়িয়া কাগজটাকে ভরাইয়া ফেলিল।

হঠাৎ দাসী ডাকিল,—বাবু একবার এদিক্‌পানে আস্‌বেন।

মনমোহন লাফাইয়া উঠিল, ছুটিয়া একেবারে শান্তির কাছে আসিয়া বসিল। শান্তির দুই গাল বহিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে।

মনমোহন খালি গায়েই ডাক্তারের বাড়ী ছুটিল। তারপর নানা কল, যন্ত্রপাতি, গ্যাসের চোং লইয়া শেষ রাত্রিটা যমের সঙ্গে যে সে কি তুমুল সংগ্রামই চলিল!

ভোরের দিকে বগলার সাড়া পাওয়া গেল, বাহিরে আসিয়া হাঁক পাড়িতেছে—মনু—ওহে মনু—

ঐ! টাকা—টাকা! টাকা আসিয়াছে!

মনমোহন ডাকিল,—শান্তি, টাকা এসেছে—

শান্তি সে কথা শুনিল কি না, তাহা লক্ষ্য না করিয়াই মনমোহন লাফাইতে লাফাইতে একেবারে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। বগলা কহিল,—কাল আর খবরটা দিতে আস্‌তে পারিনি, ভাই। তোর wifeএর খুব অসুখ, না?

—শেষ মুহূর্ত্ত!

—এঁ্যা, বালস্ কি?

—যাক্—তবু সে যদি শুনেও যায়···? বল, কি খবর?

—মেরিগোল্ড ফার্ষ্ট হয়েছে। মার্ দিস্ কেল্লা! এই দেখ, নম্বর ৩২৩০৩। তোমার টিকিটটা আনো দেখি।

সেই বিষম মুহূর্ত্ত! মনমোহনের মাথা ঘুরিতেছিল। তবুও ঠাকুরের নাম জপ করিতে করিতে কোনমতে মাতালের মত টলিতে টলিতে সে উপরে গেল। হাতড়াইয়া আল্‌মারি খুলিয়া সে টিকিট বাহির করিল। নম্বরটা?

এই যে ৩২৩০৩। বাঃ!

লাফাইতে লাফাইতে সে নীচে আসিল।

বগলা বলিল,—দাও টিকিট,—দেখি—

বগলা বাহিরে টিকিট খুলিয়া দেখিল। দমিয়া গিয়া বলিল,—

এ কি! এ যে ৩২৮০৩! ইংরিজিতে থ্রী-টা এইট-এর মত দেখাচ্ছিল! এঃ!

—এ্যাঁ! মনমোহনকে যেন উপরে আকাশে তুলিয়া নিমেষে ধপ্ করিয়া কে একেবারে নীচে ফেলিয়া দিল। সে মূর্চ্ছিতের মত সদরের কপাট ধরিয়া বসিয়া পড়িল। যখন সে ভাব কাটিল, তখন ভিতরে ছেলেমেয়েরা জাগিয়া উঠিয়া বিরাট্ ক্রন্দন জুড়িয়া দিয়াছে—মা - অ-মা,—মাগো—কথা কও না মা!...ওগো, মার কি হলো!

মনমোহন টলিতে টলিতে সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার তখন যন্ত্রপাতি তুলিয়া নীচে নামিবার জন্য সিঁড়ির উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন! মুখ মলিন। মুখে তাঁহার কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে!

গল্প ও পদ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠীবাটার সময় শ্বশুরবাড়ী হইতে দুই মেয়ে আসিয়া বিধবা মাকে ধরিয়া বসিল, ভাইয়ের বিবাহ দাও। মা বলিলেন,—এখন লেখাপড়ার সময় বিয়ে দিলে ও কি আর পাশ করতে পারবে রে! আর একটা বছর যাক্—বি-এটা পাশ করুক, তখন বিয়ে হবে।

বড় মেয়ে টেঁপি বলিল,—আমরা দু'জনে তোমার কাছে থাকতে পারি না—তুমি একলা থাকো, বৌ এলে তোমার আর কষ্ট হবে না।

মা বলিলেন,—আমার একটু কষ্ট ঘোচাবার জন্যে ওর ভবিষ্যৎ মাটী করতে পারি না ত!

ফুলি কহিল,—না হয় বৌদিকে বাপের বাড়ীতেই রেখো, যতদিন না দাদা পাশ হয়!

মা হাসিয়া বলিলেন,—তাহলে ও বই খুলে দিন-রাত বৌয়ের মুখই ভাববে—পড়া কি আর এগুবে? জানই ত ওর ধরণ!

এই ধরণটার সম্বন্ধে মার মনে সম্প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তিন মাস পূর্ব্বে দোলের সময় ফুলি আসিয়া মাকে জানাইয়াছিল, দাদা বড় চমৎকার পদ্য লিখিতে পারে! ধোপার বাড়ী কাপড় দিবার

সময় জামার পকেটে কয় টুকরা কাগজে দুই-একটা পদ্যও তিনি পড়িয়া ছিলেন। পদ্যের ভাব দেখিয়া ফুলি চমৎকৃত হইলেও মার কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়াছিল। লেখা-পড়া ঠেলিয়া রাখিয়া ছেলে যে বসন্ত আর কোকিলকে উদ্দেশ করিয়া আপনার শূন্য প্রাণের হাহাকার ছড়াইতে থাকিবে, এটুকু মার নিতান্তই সৃষ্টিছাড়া সখ বলিয়া মনে হইল। কু-এর গোড়াই এই! ছেলেকে কিছু না বলিয়া তাহার উপর আপনার নজরটুকু এই ঘটনার পর হইতে তিনি আরও কড়া করিয়া তুলিলেন।

কিন্তু কবিতা পড়িয়া অবধি দাদার উপর ফুলির শ্রদ্ধা অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল। আজ দুই বৎসর তাহার বিবাহ হইয়াছে। স্বামীর সহিত নিশীথের নির্জ্জন অবসরে সেও যথেষ্ট কাব্য চর্চ্চা করে; তাই সে দাদাকে একদিন ধরিয়া বসিল,—এ পদ্য কাকে লক্ষ্য করে তুমি লিখেছ, আমায় বলতে হবে দাদা।

দাদা কহিল,—কাকে লক্ষ্য করে লিখব আবার? মনে ভাব এসেছিল, তাই লিখেছি।

সেই দিন হইতে ফুলি ভাবিতেছিল, দাদার বিবাহ দিতে পারিলে ভাল হয়! তরুণ কবির হৃদয়ে যে অসংলগ্ন ভাবগুলা এখন কেন্দ্রহীন হইয়া এলোমেলো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একটি তরুণী বধূ আসিলে সেই সব ভাব তাহাকেই কেন্দ্র পাইয়া একটা নীড় বাঁধিবার সুযোগ লাভ করিবে। তাই সে সেবার মার কাছে দাদার এই কবি-প্রতিভা-উন্মেষের পরিচয় দিয়া বিবাহের কথা পাড়িবে বলিয়াই সঙ্কল্প করিয়াছিল; কিন্তু উপক্রমণিকার অবতারণা করিতেই মার মুখের ঘোরালো ভাব

দেখিয়া আসল প্রস্তাবটা উত্থাপনে মোটেই আর তাহার ভরসা রহিল না। সেবারে দিদি ছিল না ত! এবার দিদির সঙ্গে পরামর্শ আঁটিয়া দিদিকে দিয়াই ভূমিকা ছাড়িয়া তাই একেবারে সে আসল কথা পাড়িয়া বসিল।

দিদি অবশ্য কবিতা প্রভৃতির বড় পক্ষপাতিনী ছিল না। তাহার বিবাহ হইয়াছিল, পল্লীগ্রামে। দুই-তিনটি সন্তানের জননী হইয়াছে সে,—তাহার উপর স্বামী বিদেশে কোলিয়ারী লইয়া পড়িয়া আছে, কাব্যের চেয়ে পয়সাটারই সে বেশী ভক্ত। টেঁপিও সংসারে সহস্র কাজে লিপ্ত থাকিয়া কাব্য-চর্চ্চার দিকে ঘেঁস দিতে পারে নাই। বসন্তের অভ্যুদয়ে পল্লবিত তৃণ-মঞ্জরীর শ্যাম শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া দূরে থাক্, ছেলে-মেয়েদের সর্দ্দি-কাশীর হাঙ্গামে সে তখন এতটা বিব্রত থাকিত যে ফাল্গুন-চৈত্রে শীতলা, ওলাবিবি প্রভৃতি দেবীর উদ্দেশে মানত-উপবাস করিয়াই তাহার বসন্ত যাপন হইত। দিদি ছিল পুরা-দস্তুর কাজের লোক। কাজের দিক দিয়াই সব জিনিষের সে মাপ করিত। ফুলি তাই কাব্য ছাড়িয়া গদ্যের দিক দিয়াই দিদিকে বুঝাইয়াছিল, বধূ আসিলে মাকে আর এতটা নিঃসঙ্গভাবে গৃহ-কোণে অতীত শোকের স্তূপের উপর বসিয়া গুমরাইতে হইবে না। গৃহের সহস্র কাজে মাকে সাহায্য করিয়া বধূ মার ক্লেশ বহু পরিমাণে লাঘব করিতে পারিবে, তাহারাও দুইজনে একসঙ্গে এখানে আসিবার সুযোগ লাভ করে না, বৌ আসিলে তাহারাও পিত্রালয়ে বধূর মধুর সঙ্গের স্পর্শলাভে অনেকখানি হর্ষের অধিকারিণী হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই টেঁপি আজ ফুলিকে সঙ্গে লইয়া মার কাছে ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাব তুলিয়াছিল।

নিজের সুখ, নিজের সুবিধা—এ কথাগুলা মা কিন্তু কর্ত্তব্যেরই মধ্যে আনিলেন না। পুত্রের ভবিষ্যৎই ভাবিবার কথা! ফুলি তখন বিস্তর নজীর পাড়িয়া বসিল। তাহার দুই ভাশুরের একটা পাশেরও পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছিল। জায়েরা সুন্দরী—তবুও কোন ভাশুরের পাশের পথে কোন দেওয়াল তাহারা কোন দিন তুলিয়া ধরে নাই। তাহার ননদেরও যখন বিবাহ হয়, নন্দাই তখন বি, এ পড়িতেছে! ননদ বরাবর শ্বশুরবাড়ীতেই থাকে, সে আবার শুধু সুন্দরী নয়—রীতিমত বিদ্যাবতী! বাঙলার যত মাসিক-পত্রে ননদের বিস্তর কবিতা বাহির হয়! এ সকল সত্ত্বেও নন্দাই এম, এ পাশ করিয়া ফেলিয়াছে এবং এ-বৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা দিবে। এ পরীক্ষাও যে সে পাশ করিবে, সে বিষয়ে কাহারও মনে এতটুকু সন্দেহ নাই! তার পর সলজ্জে নিজের স্বামীর কথা পাড়িতেও সে ছাড়িল না! বিবাহের পরই ত অনঙ্গ ডবল-অনার্সে বি, এ পাশ করিয়াছে! বৌয়েরা কিছু কাঁটা গাছ লইয়া শ্বশুরবাড়ী আসে না—এবং স্বামীর লেখাপড়ার পথে কাঁটা গাছ পুঁতিবার জন্যই তাহারা জন্ম লয় নাই! পাশ-ফেলের সহিত পুরুষেরই যা-কিছু সম্পর্ক, বৌয়েদের তাহাতে কোন হাত নাই!

মা বলিলেন,—যে সব ছেলের লেখাপড়ায় আঠা আছে, বিয়ে দিলে তাদের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু সুবোধের ত পড়ায় তেমন আঠা দেখি না। দুটো পাশও যা করেছে, সে কেবল আমারই তাড়ায়। তেমন ভাল পাশ করতে পারত, তা হলেও নয় কথা ছিল!

টেঁপি কহিল,—বিয়ে দিলেই ত আর বৌকে নিয়ে অষ্ট-প্রহর ঘরের মধ্যে ও বসে থাকবে না। বৌয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে কতটুকু! বৌ ত তোমার কাছেই সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকবে, মা। দিনের বেলায় পড়া-শোনা ছেড়ে সুবোধও কিছু বৌয়ের সঙ্গে গল্প করতে আসছে না।

মা পাকা গৃহিণী, কঠিন অভিভাবিকা, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিও তাঁহার বিলক্ষণ। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—তবু সারাদিন ঐ বৌয়ের মুখখানি দেখবার জন্যেই ছেলে উস্‌খুস্ করবে! পড়ায় কি আর মন থাকবে! তার উপর আবার বলছিস, ঐ রকম সব পদ্য লিখতে আরম্ভ করেছে।

ফুলি কোন কথা কহিল না। সে ভুক্তভোগী। তাহার স্বামী দিনের বেলায় সকলে ঘুমাইলে কত অছিলায় অন্দরে আসিয়া তাহার সহিত কিরূপ দুষ্টামি করিত—মুখে পাণ পুরিয়া, খোঁপা খুলিয়া, কাপড়ে এসেন্স ঢালিয়া দিয়া—নানা উৎপাতে কি রকম বিব্রত করিত, তাহা সে কোন দিন ভুলিবে না! তাই সে মার এ কথায় মনে মনে একটু হাসিল।

টেঁপি কহিল,—পদ্য লিখছে, ও একটা সখ! পাঁচখানা বই পড়ে। তারই পাঁচটা ভাব নিয়ে জুড়ে-তেড়ে পাগলামি করে! পড়ার অবসরে ও ওদের এ-বয়সের একটা খেলা বৈ ত নয়!

মা বলিলেন,—সুবোধ নিজে কিছু বলেছে না কি, বিয়ের কথা?

টেঁপি জিভ্ কাটিয়া বলিল,—সে ত আর ক্ষেপেনি! শুধু তোমার সুবিধের জন্যে বলছিলুম। তার উপর আরও একটা

কথা আছে মা, বিয়ে দেওয়া এই বয়সেই মানায়। শেষে যে সভায় গিয়ে বুড়ো-ধেড়ে বর বসবে, মুখে একরাশ গোঁফ নিয়ে—সে দেখতে ভারী বিশ্রী! একটা উদাহরণও সে যোগাইয়া দিল। তাহার শ্বশুরবাড়ীর পাশে ও-মাসে একটি মেয়ের বিবাহ হইয়াছে। বর আসিয়া সভায় বসিল,—গায়ে গরদের কোট, দাড়ি-কামানো গালে সবুজ দাগ, আর মুখে একরাশ গোঁফ! পাড়ার মেয়েরা টিট্‌কারী দিয়া বলিয়াছিল, মাগো, এ বর, না, বরের বাপ? বিবাহ-রাত্রির অত যে আলো, তা সে ধেড়ে বরের গোঁফের ছায়ায় একেবারে যেন কালো হইয়া গিয়াছিল! বাসর-সঙ্গিনীরা বাসর জাগিতে আসিয়া লজ্জায় মুখ তুলিতে পারে নাই!

ইহার পর প্রতিদিনই এই প্রস্তাব লইয়া মা ও মেয়েদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিল। অবিরল বৃষ্টিধারায় কঠিন মাটিও গলিয়া যায়, এ ত মাব মন! মা শেষে প্রত্যাখ্যাতা এক ঘটকীকে একটু আশা দিয়া বলিলেন,—বেশ, এই শনিবারে আমার ছোট জামাই আসছে—নয়, ঠিক কর, বাছা। রবিবার সকালে সে আর ও-বাড়ীর বড়ঠাকুর দুজনে গিয়ে মেয়ে দেখে আসবে।

এ ঘটকীটি নিরাশ হইয়াও হাল ছাড়ে নাই। এ কথায় খুসী হইয়া এক-মুখ হাসিয়া সে বলিল,—এ ত মেয়ে নয় মা, যেন পরী! নামেও পরী, চেহারাতেও তাই। তবু পাড়াগাঁয় থাকে। বারো উত্‌রে এই গেল ফাগুনে তেরোয় পড়েছে। বাপ মস্ত জমিদার। মেয়ে এখানে এসেছে মামার বাড়ী, এক বিয়ের নেমন্তন্ন। মেয়ের বাপ খরচ-পত্রও করবে খুব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আষাঢ়-মাসের মাঝামাঝি জমিদার-কন্যার সহিত সুবোধের বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির সময় বৌয়ের টুক্‌টুকে মুখ ও আয়ত চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখিয়া তরুণ কবি মুগ্ধ হইল।

ফুলশয্যার রাত্রে লোকের ভিড় চুকিলে টেঁপি ও ফুলি যখন বধূর হাত ধরিয়া শয্যার উপর তাহাকে আনিয়া বসাইল, সুবোধ তখন বিছানারই অপরপ্রান্তে জড়ভরতের মত বসিয়াছিল। বাহির হইতে মা হাঁকিলেন,—অনেক রাত হয়ে গেছে সুবোধ, বৌমা ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল—ছেলেমানুষ! ওকে আজকের রাতটা আর জাগাস্‌নে যেন! ঘুমোতে দিস্‌।

কথাটা সুবোধের সর্ব্বাঙ্গে যেন বিষ ছড়াইয়া দিল। টেঁপি মৃদু হাসিল। ফুলি মৃদুস্বরে কহিল,—মার যেমন কথা! আজ একটা রাতের মত রাত! আজ কখনো কোন বৌয়ের ঘুম পায়! বৌদি কিন্তু খুব চালাক, দিদি, অছিলে করে এ-রাতটায় কেমন মিয়ে নিলে!

তার পর বৌয়ের গায়ে ছোট একটা ঠেলা দিয়া হাসিয়া বলিল,—কি বল বৌদি, এখন বাকী রাতটুকু কোমর বেঁধে জাগতে পারবে বলে মনে হচ্ছে ত?

টেঁপি বলিল,—আয় ফুলি, আমরা যাই। সুবোধ, তুই দোরটা দিয়ে শুয়ে পড়্‌। অনেক রাত হয়ে গেছে।

ফুলি যাইবার সময় বৌয়ের কানে-কানে একটা উপদেশ দিয়া গেল,—দেখ ভাই বৌদি, দাদাকে খুসী করো। দাদা যেন নিন্দে না করে।

দিদি ও ফুলি চলিয়া গেলে সুবোধ দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিতে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। বিছানার কাছে আসিয়া সে দেখিল, বধূ একহাত ঘোমটা টানিয়া পুতুলের মতই মৌন মূক বসিয়া আছে। এই কাপড়ে ঢাকা মূর্ত্তিটিকে দেখিলে কিছুতেই জীবন্ত মানুষ বলিয়া মনে হয় না ।

বাহিরে ফুটন্ত জ্যোৎস্নায় চারিধার ভরিয়া গিয়াছে। মেঘহীন নির্ম্মল আকাশ—গুমট মোটেই নাই। বেশ একটু স্নিগ্ধ বাতাসও সুরু করিয়াছে। কাচের আবরণে বাতির আলো মৃদু কাঁপিতেছিল। ঘরের কোণে একটা কার্পেট জড়ানো পড়িয়াছিল। সুবোধ নিঃশব্দে কার্পেটখানা মেঝেয় বিছাইল, পরে বিছানার কাছে আসিয়া বধূর সুন্দর কোমল হাতখানি আপনার হাতে ধরিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল,—পরি—

পরি নড়িল না, সে স্বরে চমকাইলও না।

সুবোধের সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া একটা বিদ্যুতের প্রবাহ ছুটিল। পরির হাত ধরিয়া সুবোধ কহিল,—তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবন চিরদিনের জন্য মিলনসূত্রে বাঁধা পড়ল। আজ এই মধুর জ্যোৎস্না রাত্রে আমাদের প্রথম পরিচয়—! কথাটা এইখানেই বাধিয়া গেল। তাহার সারা দেহে কেমন কাঁটা দিয়া উঠিল। তাইত, এ কথাগুলা নেহাৎ নাটকের বাঁধা বুলির মতই শুনাইতেছে না! আজিকার পরিচয়টুকু শুধু মৌন নির্ব্বাক দৃষ্টির মধ্য দিয়াই পরিস্ফুট করা ঠিক নয় কি! সে নিজেই যে আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে কবিতা লিখিয়াছে,

তুমি চেয়ে থাক আর আমি চেয়ে থাকি
এ চাওয়ার পরিচয় থাকিবে না বাকি!

তবে ?

ঠিক কি-ভাবে প্রথম পরিচয়টুকু জমাইয়া তোলা যায়, সুবোধ স্থির করিতে পারিল না। বন্ধুর দল নানা ইঙ্গিত দিয়াছিল; কিন্তু সবগুলা একসঙ্গে জোট পাকাইয়া সুবোধকে বিব্রত করিয়া তুলিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, হায়রে, বুদ্ধির দোষে জীবনের এই চরম ক্ষণটুকু নিষ্ফল আড়ম্বরেই বুঝি-বা কাটিয়া যায়!

শেষে একটা কথা মনে পড়িল। তখন সে পরিকে কহিল,—একবার বিছানা থেকে নেমে ঐ কার্পেটটায় এসে বসবে ?

পরি কোন কথা কহিল না। তাহার মনের কথা জানিবার জন্য মুহূর্ত্তকালও প্রতীক্ষা করা সুবোধ সমীচীন মনে করিল না। সময় না স্রোত চলিয়াছে! পরির হাত ধরিয়া তখন সে মৃদু টান দিল, বলিল,—এসো, নেমে এসো।

পরি এবার ঈষৎ নড়িল, নড়িতেই পায়ের মল বাজিয়া উঠিল ঝুমর্-র্!

সুবোধ শিহরিয়া উঠিয়া কহিল,—চুপ, চুপ, মলের আওয়াজ নয়। সকলে শুনতে পাবে। মলটা খুলে ফেল।

মলের মুখরতায় বধূ সঙ্কুচিতা হইয়াছিল; সুবোধের সতর্কতার ইঙ্গিতে লজ্জায় ঘোমটার আড়লে ঈষৎ হাসিয়া মুখ বাঁকাইল। আনন্দে সুবোধের চিত্ত ভরিয়া উঠিল। এই যে জীবনের স্পন্দন দেখা দিয়াছে! সুবোধ কহিল,—লক্ষ্মীটি, মল খুলে ফেলো।

পরি মল খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার অসতর্ক হাতের স্পর্শে মল আবার বাজিয়া উঠিল, ঝুন্-ন্!

সুবোধ তখন হাত বাড়াইয়া মল ধরিয়া কহিল,—দাও, আমি খুলে দি। তুমি পারবে না।

পরি সুবোধের হাতটা সরাইয়া দিল, দিয়া মল খুলিয়া বালিশের পাশে রাখিল। সুবোধ সে করুণায় গলিয়া গিয়া চকিতে পরির মাথার কাপড় সরাইয়া তাহার অধরে ত্বরিতে একটা চুম্বন-রেখা অঙ্কিত করিল।

লজ্জায় তাহার মুখখানাকে ঠেলিয়া দিয়া পরি বালিশে মুখ লুকাইল। সুবোধের সর্ব্ব শরীর দারুণ আবেগে কাঁপিয়া উঠিল। পরিকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিল,—লক্ষ্মীটি, নামো একবার। আচ্ছা, আমি নয় সরে যাচ্ছি। সুবোধ সরিয়া গেল।

পরি নিঃশব্দে নামিয়া কার্পেটে আসিয়া বসিল। সুবোধ গদির তলা হইতে একরাশ কেতাব-পত্র টানিয়া বাহির করিল, ও নিজে পরির পাশে আসিয়া বসিয়া কহিল,—দুজনে একটু পড়ি, এসো। এ জীবনটা কাব্যের আলোয় ভরপুর করে রাখব আমরা, পরি। আমি নিজেও কবিতা লিখি। সেইগুলোই পড়ি, এস। তোমার জন্যে কতদিন ধরে প্রতীক্ষা করে আছি, কত দীর্ঘ দিন, কত মাস, কত বৎসর! তোমারি উদ্দেশে কত গান গেয়েচি! তুমিও পড়, দেখ।

কথাগুলায় কোন সায় না দিয়া পরি ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়াই বসিয়া রহিল। সুবোধ অত্যন্ত চাপা গলায় তাহার হৃদয়-নিঃসৃত কাব্য-গাথা পড়িতে লাগিল।

সে শুধু কবিতা পড়িয়া চলিয়াছিল, আর মাঝে মাঝে বাছা-বাছা ছত্রগুলায় বধূর তারিফ পাইবার আশায় ঘোমটার আবরণের পানে ব্যাকুল চিত্তে চাহিতেছিল। নিজের প্রেম-সঙ্গীতে তন্ময়, আত্মহারা হইয়া যখন সে ভাবিতেছিল, আজিকার

ঐ জ্যোৎস্না-নিবিড় রাত্রিটি শুধু তাহারই জন্য উদয় হইয়াছে, মিলনের এই মধুর ক্ষণটি সত্য না বিভ্রম বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে যখন তাহার রোমাঞ্চ হইতেছিল। এবং বধূর মধুর হৃদয়ে, শুধু প্রেম নহে, দিব্য একখানি শ্রদ্ধার আসনও সে পাতিতে সক্ষম হইয়াছে ভাবিয়া সানন্দে মৃদু কম্পিত কণ্ঠে যখন সে পড়িয়া চলিয়াছে,

মম হৃদয়-হরণে এসো মধুরা বালিকা,—
এস গো, তব কণ্ঠে দুলায়ে কুন্দ-কুসুম-মালিকা।

ঠিক এমনই সময়ে বধূ ঘুমে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া বালিশের উপর ঢুলিয়া পড়িল। সুবোধের বুকে কে যেন একখানা পাথর ছুড়িয়া মারিল। খাতা বন্ধ করিয়া সে নিদ্রিতা বধূর পানে চাহিল। রাগ হইল। এই তাহার স্ত্রী—তাহার চিরজীবনের সকল সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী এ-ই! হায়, কবির হৃদয়-কুঞ্জের অজস্র পুষ্পিত তরু-লতা, আষাঢ়ের এই স্নিগ্ধ সজল বাতাস, এই আবেশ-করা পাখীর গান, —এক অকরুণ হৃদয়ের নির্ম্মমতায় সব এক-নিমেষে পাষাণের স্তূপে পরিণত হইয়া গেল!

খাতা-পত্র গদির নীচে গুঁজিয়া রাখিয়া পরিকে উঠাইয়া সুবোধ শয্যাপ্রান্তে আপনার আহত স্বামি-মর্য্যাদাকে লুটাইয়া দিল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে সে চাহিয়া দেখে, পরি ঘরে নাই। সে একেবারে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। বাহিরে কাহারা কথা কহিতেছিল। ফুলির স্বর কানে গেল। ফুলি হাসিয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে অমনি মল বাজিল। রাগে সুবোধের গা জ্বলিয়া উঠিল। এ কি, তাহারই হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলাকে দুই পায়ে মাড়াইয়া ধরিয়া বাহিরে উহাদের উপহাস-নৃত্য চলিয়াছে, তবে!

সুবোধ উঠিয়া বাহিরে গেল—যাইবার সময় বারান্দায় উপবিষ্টা ভগ্নী ও বধূর পানে জ্বালা-ভরা একটা চাহনি নিক্ষেপ করিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আহারের পর ফুলি আসিয়া দাদাকে যে সংবাদ দিল, তাহাতে তাহার চোখের সম্মুখ হইতে রঙ্গমঞ্চের চকিত-দৃশ্য-পরিবর্ত্তনের মত সমস্ত পৃথিবীখানা তাহার বিচিত্র হাস্য-শোভা লইয়া কোথায় সরিয়া গেল ও তাহার স্থলে নিমেষে এক শ্মশানের দীর্ণ ভীষণ দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। বধূ পরিমলের বিদ্যার দৌড় বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ অবধি!

পরিমলের দিদি বয়সে তাহার চেয়ে ন' দশ বছরের বড়। বনিয়াদী জমিদারী-বংশের চিরপ্রথা ভাঙ্গিয়া বৃদ্ধা ঠাকুরমার সহস্র নিষেধ ঠেলিয়া ফেলিয়া বাঙ্‌লা, সংস্কৃত ও ইংরাজী, এই ত্রিবিধ বিদ্যায় তাহাকে পারদর্শিনী করিয়া তুলিবার জন্য পিতা ও স্বামীর গৃহে যখন রীতিমত চেষ্টা চলিতেছিল, ঠিক সেই সময় সে বিধবা হইল। বৃদ্ধা ঠাকুরমা কাঁদিয়া বলিলেন,—তখনই বলেছিলুম, এ বংশে মেয়েদের লেখা-পড়া শেখা সয় না—আমার সে কথা না মেনে মেয়েটার কি সর্ব্বনাশই করলি রে তোরা! তখন নজীর-পত্রের আলোচনা করিয়াও জমিদার-পরিবার জন্যে একেবারে কাঁটা হইয়া গেল। দেখা গেল, যে-মেয়েরা বইয়ের পাতাও কখনও খোলে নাই, তাহারাই পাকা মাথায় সিঁদূর পরিয়া বসিয়া আছে—আর যে দুই-চারিটা বালিকা স্বামীর ও নিজের—

জিনে কেতাব ছুঁইয়াছে, সেইগুলাই কি না সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া চোখের জলে ভাসিয়া সারা হইতেছে! যাক্, যা হইয়া গিয়াছে, তার ত আর চারা নাই। ভবিষ্যতের জন্ম এ বিষয়ে সকলেই সতর্ক হইল। পরিমল দ্বিতীয়ভাগ পড়িতেছিল। ঠাকুরমার আদেশে তাহার সে ছেঁড়া কুণ্ডলী-পাকানো বইখানা একদিন অগ্নিদেবের জঠরে নিক্ষিপ্ত হইল এবং অন্তঃপুরে কেতাবের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

সুবোধ হতাশের মত ফুলির পানে চাহিয়া বলিল,—কিন্তু আমি ও-সব মানি না, ফুলি। তুই মানিস?

ফুলির বুকটাও এ কথায় একবার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু দাদার মুখের পানে চাহিয়া তাহার সাহস বাড়িল। সে কহিল,—ও-সব দাদা কপালের কথা! বই পড়ার সঙ্গে বুঝি আবার তার কোন সম্পর্ক আছে!

সুবোধ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আমি তাহলে বই আনব'খন। তুই ফুলি, ওকে একটু পড়াস্ ভাই, লক্ষ্মীটি!

ফুলি কহিল,—কিন্তু আমি আর ক'দিনই বা আছি, বল? এর পর তোমার কাছেই শিখবে'খন।

সুবোধ হতাশ হইয়া পড়িল। দ্বিতীয় ভাগ! ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য বানান মুখস্থ করাইয়া—ওঃ, কত দিনে এই স্ত্রীকে সে তাহার কাব্যের সমঝদার করিয়া তুলিবে! হায়রে, তাহার মনে সে কত সাধ ছিল, কত আশা—! বন্ধুদের স্ত্রীরা কত লেখাপড়া জানে—দুই-একজন কেমন পদ্যে চিঠিপত্রও লিখিতে পারে, আর তাহার অদৃষ্টে এ কি হইল? একে ত গৃহে কঠিন শাসনের চাপে পড়িয়া সে ভীষণ দুঃখ সহ্য করিতেছে! ভাবিয়াছিল, বিবাহ করিয়া

বিদুষী পত্নীর সহানুভূতির সরস ধারায় কবিত্বের ছোট চারাটিকে বড় করিয়া তুলিবে—পত্নীর প্রেমের ধারা পাইয়া সে গাছে কত বিচিত্র ফুল ফুটিবে! কিন্তু অমিয়-সাগরে সিনান্ করিতে সকলি গরল ভেল! এখন বন্ধুদের কাছে এই নিরক্ষরা পত্নীর পরিচয় দিবে সে কি বলিয়া। বন্ধুরা যখন তাহাদের স্ত্রীদের বিচিত্র গল্পে সন্ধ্যার আসর জাঁকাইয়া তুলিবে, তখন সে নির্বাক হতাশে পরের গল্পই শুনিয়া যাইবে—নিজের বলিবার তাহার কিছুই থাকিবে না—! মূর্খ স্ত্রীর কাছে আদর-সোহাগের কিরূপ বচন, আলাপ-আপ্যায়নে কিই বা সরসতা সে প্রত্যাশা করিতে পারে! তাহার জীবনের ছন্দ চিরদিনের জন্য কাটিয়া গিয়াছে—মিল নাই, কোথাও মিল নাই—আগাগোড়া একেঘেয়ে শুধু গদ্যের লাইন চলিয়াছে! কি দারুণ দুর্দ্দৈব!

দাদাকে নীরব দেখিয়া ফুলি টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একখানা বই নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—বৌদিকে কেমন দেখলে দাদা?

সমস্ত পৃথিবীর উপর সুবোধের রাগ ধরিয়াছিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল,—জানোয়ার!

ফুলির সদ্য-স্নাত সুন্দর মুখে একটা মেঘের ছায়া পড়িল। সে চিন্তিতভাবে কহিল,—না দাদা, ভারী চমৎকার লোক। এমন মিশুনে, আর কথাবার্ত্তাগুলি কি মিষ্টি! কে বলবে যে লেখাপড়া জানে না! হাসিটু মুখে অমনি লেগেই আছে।

সুবোধের ইচ্ছা হইল, সে বলে, ও হাসি লইয়া তোরা ধুইয়া খা! কিন্তু বলিতে পারিল না।

ফুলি কহিল,—তোমার সঙ্গে বুঝি মোটে কথা কয়নি?

আহা, কাল ওর কম কষ্ট গেছে ! সারাদিন—তবে'পে সেই রাত এগারোটা অবধি পুতুলের মত কাঠ হয়ে বসে থাকা—এ কি মানুষে পারে, দাদা ? তাই আর কি ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সুবোধ কহিল,—রামায়ণে কুম্ভকর্ণের ঘুমের কথা পড়ে মনে হত, সে বুঝি কবির অতিরঞ্জিত কল্পনা ! এখন আর আমার সে বিশ্বাস নেই।

দাদার কথায় ফুলির হাসি পাইল। নিজের ফুলশয্যার কথা মনে পড়িল। কি ঘুমই পাইয়াছিল। সারারাত্রি অনঙ্গ ঘুমাইতে দেয় নাই, কি জ্বালাতনই না করিয়াছিল ! মুখে একটু ঘোমটা অবধি রাখিতে দেয় নাই ! আর রাজ্যের যত বাজে গল্প, ছোট কথা ! এখনও সে-সব মনে পড়িলে হাসি পায় !

ফুলি কহিল,—আজ আমি বৌদিকে দিনের বেলাতেই ঘুম পাড়িয়েছি। কড়া পাহারা দিচ্ছি, সে ঘুম কেউ না ভাঙ্গায় ! আজ রাত্রে দেখো, বৌদি চোখের পাতা মুড়বে না, একেবারে।

ভগ্নীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় সুবোধের প্রাণ ভরিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া একখানা বাঁধানো নূতন উপন্যাস আনিয়া ফুলিকে কহিল,—এই নে। তুই সেদিন বলছিলি না, বিশ্বদীপ কাগজে মাধুরী বলে যে উপন্যাসখানা বেরুচ্ছিল, তার শেষটা তুই পড়িস নি ? তা সেটা বই হয়ে বেরিয়েছে—বেশ ভাল বই—তোর জন্যে একখানা কিনে এনেছি। ওখানা তোকেই দিলুম।

ফুলি দাদার পানে কৌতুক-হাসিমিশ্রিত দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া বইখানা হাতে লইল। দাদার এ ঘুষ দেওয়ার অর্থও বুঝিল, অর্থাৎ বৌদিকে ব্রেক করিয়া দিতে হইবে।

দাদার পানে চাহিয়া সে কহিল,—তোমার ত এখন আর কোন কাজ নেই, দাদা। তুমি বরং একটু ঘুমিয়ে নাও!

সেদিন রাত্রে ফুলির চেষ্টায় বধূকে একটু সকাল-সকালই ঘরে পাঠানো হইল।

বধূ বিছানায় শুইয়াছিল—আপাদ-মস্তক একখানি রঙ-করা কাপড়ে ঢাকা। সুবোধ অত্যন্ত সতর্কভাবে নিঃশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া বধূর পাশে শুইয়া পড়িল। কিন্তু বধূকে সম্পূর্ণ অবিচলিত দেখিয়া এক মিনিট পরেই একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আত্মগতভাবে সে বলিল,—উঃ, এমনি মাথা ধরেছে! যাহার উদ্দেশ্যে কথাটা বলা, সে বেচারা তখনও কাঠের মতই নিঃশব্দে বিছানায় পড়িয়া ঘামিয়া সারা হইতেছিল। এ কথায় সে একটুও নড়িল না।

সুবোধ দেখিল, ঔষধ ধরিল না। সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, আবার একটা স্বগত-উক্তি নিক্ষেপ করিল,—মাথা যেন খসে যাচ্ছে।

তবুও কোন দিক হইতে সহানুভূতির কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সুবোধ আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, একেবারে বিছানা হইতে উঠিয়া খড়খড়ির পাশে আসিয়া বসিল। খড়খড়ির ওধারে সরকারদের বাগান। গাছগুলার উপর জ্যোৎস্না অমনি লুটাইয়া পড়িয়াছে! বাগানের ওপারে কে বাঁশী বাজাইতেছিল। সুবোধের মনে হইল, বাঁশীটি যেন তাহারই দুঃখে বড় করুণ সুরে কাঁদিতেছে! সুবোধ বাঁশী শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিল, এখনই পরি নামিয়া আসিয়া তাহার তপ্ত ললাটে কোমল হাত দুইটি বুলাইয়া দিবে! ঐ না, খাটটা নড়িয়া উঠিল! সুবোধ চাহিয়া দেখে, কোথায় কি! খাট নড়িল না।

সুবোধ ভাবিল, আর এভাবে অপেক্ষা করা ঠিক হইবে না। পাড়াগেঁয়ে মূর্খ বধূ এখনই ঘুমে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে। সে ঘুমের পরিচয় আবার কাল রাত্রে দস্তুরমতই সে পাইয়াছে! সুতরাং আর নয়, এ যে অভিমান করিয়া নিজের পায়ে নিজেই সে কুড়ুল মারিতে বসিয়াছে!

সুবোধ তখনই নামের মর্য্যাদা রাখিয়া শান্তভাবে আসিয়া বিছানায় ঢুকিল, এবং একেবারে শুইয়া পড়িয়া ফোঁস্ করিয়া একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফেলিল। দুঃখে ক্ষোভে তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। হায়রে, নারীর প্রাণ এমনই পাষাণে গড়া! এই নূতন অতিথির এতটুকু পরিচয় পাইবার লোভে সে একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছে, আর ও-পক্ষে এতটুকু আগ্রহ নাই!

হঠাৎ যেন তাহার মনে হইল, হাতের চুড়িতে রাগিণী উঠিয়াছে, ঠিন্ ঠিন্, সঙ্গে সঙ্গে পাখার বাতাস গায়ে লাগিতেছে! সুবোধ পাশ ফিরিল। ফিরিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে অবাক হইয়া গেল। পরি বিছানায় বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে! ঘোমটার মাত্রা একটুও কমে নাই। পাখাটা কলের মত নড়িতেছে। সুবোধ উঠিয়া বসিয়া পরির হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইল এবং তাহার মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিয়া একেবারে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

সে রাত্রে বিস্তর বাজে কথার জালের মধ্য হইতে বাছিয়া যে কয়টি কাজের কথা সুবোধ বধূর কাছ হইতে উদ্ধার করিল, তাহা এই :—

১। পরি দ্বিতীয় ভাগ ভুলিয়া গিয়াছে—তবে অক্ষরগুলা এখনও মনে আছে।

২। বাপের বাড়ীতে পড়িবার একেবারেই সুবিধা হইবে না। ঠাকুরমার নিষেধ সেখানে এখন পূর্ণমাত্রায় রাজত্ব করিতেছে। তাহাকে বই খুলিতে দেখিলে অনর্থপাত হইবে। তবে এখানে যখন সে ঘর করিতে আসিবে, তখন সুবোধের কাছেই নিশীথের স্তব্ধ গোপন অবসরে লেখা-পড়া শিখিতে তাহার কোন আপত্তি নাই।

৩। সুবোধকে পরির খুব—খুব পছন্দ হইয়াছে। সুবোধ বেশ সুন্দর। পরির ঠাকুরমা বলিয়াছিলেন, পরির বরের রূপে সভা আলো হইয়া গিয়াছে!

আনন্দের আবেগে বধূর অধরে সুবোধ কৃতজ্ঞতার ছাপ মারিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহের আসর ভাঙ্গিলে বোনেরা শ্বশুড়বাড়ী চলিয়া গেল। যাইবার সময় টেঁপি বলিল,—দেখিস্, যেন পড়ায় অবহেলা করিসনে,—পাশ না হলে বৌয়েরই সকলে দোষ দেবে!

ফুলি চুপি চুপি বলিল,—দাদা, মা কাল বলছিল, আমি লিখে দিচ্ছি, তোরা দেখে নিস্, সুবোধ কখ্‌খনো এবার পাশ হবে না। দেখো দাদা, পড়ায় গাফিলি করো না ভাই, ক'টা মাস বৈ ত নয়!

ওদিকে শ্বশুরবাড়ী হইতেও এই ধুয়াই সে শুনিয়া আসিয়াছে। দিদিশাশুড়ী বলিয়াছেন,—বাঙলা বিয়ে যেমন চট্ করে পাশ করলে, দাদা, তোমাদের ইংরিজি বি, এটাও তেমনি পাশ করে

আমাদের পরির পয়টা রেখো দিকিন্! শাশুড়ী জমিদারী বংশের প্রথা মানিয়া জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করিতে পারিলেন না—আড়াল হইতে বিধবা কন্যা অপর্ণার মারফৎ জানাইলেন, এ বৎসর ভাল করিয়া পড়িয়া পরীক্ষাটা চুকাইয়া দাও—ইত্যাদি।

সুবোধ জ্বলিয়া গেল। পাশ! পাশ! পড়া আর পড়া! জীবনটার সৃষ্টি হইয়াছে কি কেবল কতকগুলা বই মুখস্থ করিয়া এগ্জামিন পাশ করার জন্যই। আর কোন কাজ নাই—উদ্দেশ্য নাই! এই যে বিশাল মানব-চিত্তে কত সাধ-আশার পুলক-নৃত্য চলিয়াছে, তাহার পানে কেহ চাহিবে না! আনন্দ-রস বিশ্ব-ভুবনে অজস্র ধারায় উছলিয়া পড়িতেছে, তাহার এক ঝলকও পান করিবে না? ষ্টীম-রোলারের মত কতকগুলা ভারী কেতাব তাহাদের মামুলি বুলিটুকুকে মনের উপর পিষিয়া গাঁথিয়া দিলেই মানুষ অমনি চতুর্ভুজ হইয়া যাইবে না কি!

তার পর সুবোধের সুকঠিন বিরহ-তপ আরম্ভ হইল। দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ মাস ধরিয়া পরির ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকুকে অবলম্বন করিয়াই তাহার দিন কাটিতে লাগিল। চিঠি লিখিয়া ফল নাই—ওদিক হইতে কোন স্পন্দনই মিলিবে না! লিখিলেও পরি সে চিঠির মর্ম্ম বুঝিবে না—ঐক্য-বাক্যের বানানই সে ভুলিয়া গিয়াছে! আর-কেহ চিঠি পড়িয়া যদি জবাব লিখিয়া দেয়? কিন্তু হায়, পরের সে লেখায় পরির হৃদয়ের কতটুকুই বা সন্ধান মিলিবে! অপরের মারফতে প্রেমের অভিনয় করা! ছি! আজেই চিঠি লিখিয়া যখন ফল নাই, তখন সে নূতন করিয়া খাতা বাঁধাইয়া তাহারই সাদা পৃষ্ঠায় বিরহের ঢেউ তুলিল।

মাকে খুসী রাখিবার জন্য আবার এ দুর্দ্দিনে পড়ার বইও খুলিয়া বসিতে হয়! কিন্তু চোখ যখন ইংরাজী হরফগুলার উপর শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, মন তখন কল্পনার রঙীন ফানুষে চড়িয়া কোথায় সুদূরে কোন্ অজানা পল্লীর গৃহের কিনারে উড়িয়া বেড়ায়! অজানা পথে, অজানা ঠাঁইয়ে অবলম্বন কিছুই মেলে না! ব্যর্থতার ঘা খাইয়া কল্পনার ফানুষ ছিঁড়িয়া চূর্ণ হইয়া যায়—মনটাও ক্ষতবিক্ষত হইয়া ফিরিয়া আসে।

এমন সময় হঠাৎ একদিন একটু সুরাহার সম্ভাবনা ঘটিল। মার আদেশে শ্বশুরবাড়ীতে সে পূজার নিমন্ত্রণ রাখিতে গেল। অনেকখানি আশা লইয়াই সে গিয়াছিল, কিন্তু ফিরিল, নিরাশার তীরে বুক ছিঁড়িয়া। সেখানে যেদিন সে পৌঁছিল, সেদিন দিনের বেলায় পরির দেখা মিলিল না, বাড়ীর বাহিরের লোক তাহাকে লইয়া অস্থির! রাত্রিটা যাত্রার আসরে কীচক-বধের পালা দেখিয়াই কাটিল। দ্বিতীয় দিনে দুপুরবেলায় সে আশা করিয়াছিল, পরির দেখা মিলিবে—শেষে অধীর প্রতীক্ষায় মধ্যাহ্ন যখন অপরাহ্নের গায় ঢলিয়া পড়িয়াছে, তখন অপর্ণা আসিয়া কৈফিয়ৎ দিল, কাল সারারাত্রি জাগিয়া যাত্রা শুনিয়া পরি আজ ঘুমে কাদা হইয়া ঢুলিয়া পড়িয়াছে—মুখে অবধি কিছু দেয় নাই! সুবোধের সর্ব্বাঙ্গে কে যেন কাঁটার চাবুক মারিল। এই তাহার স্ত্রী! ইহারই উদ্দেশে সে পড়া ফেলিয়া রাত্রি জাগিয়া কবিতা রচনা করিয়াছে!

রাগে অভিমানে সেই রাত্রেই সে বাড়ী ফিরিল। আসিবার সময় নিমেষের জন্য পরির সঙ্গে দেখা হইলে সে অভিমানের দুইটা ফাঁকা গর্জ্জন ছাড়িয়াছিল; কিন্তু পরির মৌনতার বর্ম্মে

ঠেকিয়া সে গর্জ্জন শুধু শূন্যে মিশিয়াছে, চিত্তে তাহার বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য তুলিতে পারে নাই!

মাঘ মাসে ফুলির শ্বশুরবাড়ীর সকলে পশুপতিনাথ-দর্শনে বাহির হইল। অনঙ্গও ভগ্নীপতির সঙ্গে বোম্বাইয়ে বেড়াইতে গেল। ফুলিকে তাহার শাশুড়ী বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

ফুলি আসিলে মা কিন্তু প্রথমেই সুবোধের সম্বন্ধে অনুযোগ তুলিলেন। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে। ছেলের পড়ার ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া ইচ্ছা থাকিলেও বধূকে তিনি এখানে আনেন নাই—কিন্তু ছেলের অন্যমনস্ক উদাস ভাব তাহার সতর্কতা-সত্ত্বেও তাঁহার নজর এড়ায় নাই। বই খুলিয়া ছেলে যে আকাশের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, তাহাও মার চোখে পড়িয়াছে। তাঁহার বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে। এখন যা হোক, সুবোধের বয়স হইয়াছে, ভাল-মন্দও বিলক্ষণ সে বুঝিতে শিখিয়াছে। বৌ ত আর পলাইবে না! এ কথা কেন যে সে বুঝিতে পারে না! অথচ এ অবহেলা তাহার পাওনা-গণ্ডা কড়াক্রান্তিতে উশুল করিতে ছাড়িবে না! আর তিনি কি চিরদিনই এমনি গোয়েন্দাগিরি করিয়া কাটাইবেন! পূর্ব্বে তাহা বেমানান ছিল না—এখন মাঝখানে বৌ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, গোয়েন্দাগিরি ভাল দেখায় না! এখন কোন কথা বলিতে গেলে বৌয়ের গায়ে ঠেশ লাগিবে! তিনি মা, কাজেই তাঁহাকে এখন নিরুপায়ে চুপ করিয়া চোখেই শুধু সব দেখিয়া যাইতে হয়—অস্বস্তি ধরে, গা নিষপিষ করে, তবু কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলা যায় না! পাছে ছেলে ভাবে, বৌয়ের উপরই বুঝি মার যত-কিছু আক্রোশ!

দুপুরবেলা সুবোধ আপনার উপরের ঘরেই চোখের সম্মুখে মার্টিনো খুলিয়া খাটে শুইয়াছিল। নীতিবিজ্ঞানের বড় বড় উপদেশগুলা মনে ঢুকিবার দিকে যখন এতটুকু ঝোঁক দিতেছিল না, তখন ফুলি আসিয়া ডাকিল,—দাদা—

সুবোধ বই মুড়িয়া কহিল,—কে, ফুলি? আয়। ইস্, তুই যে বড্ড রোগা হয়ে গেছিস্ রে! কোন অসুখ করেছিল?

ফুলি সবিস্ময়ে কহিল,—না!

সুবোধ এই ক্ষণটুকুরই প্রতীক্ষায় ছিল। সে জানিত, ফুলি এ ঘরে আসিবেই। তাই সে আহার সারিয়া আজ বাহিরে যায় নাই, একেবারে উপরের ঘরে উঠিয়াছিল।

ফুলি কহিল,—বৌদির খপর কি, দাদা? চিঠিপত্র লেখে?

সুবোধ হতাশের হাসি হাসিয়া বলিল,—লেখাপড়া কি জানে যে লিখবে! তারপর সুবোধ একেবারেই আপনার অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা পাড়িয়া বসিল। স্ত্রী বাপের বাড়ীতে আছে, ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু লেখাপড়া শিখিবার পক্ষে এই যে তাহার যোগ্য কোমল বয়সটুকু ঔদাস্যে অবহেলায় কাটিয়া যাইতেছে, ইহার উপায় কি হইবে! বেশী বয়সে লেখাপড়া শেখা কি সহজ ব্যাপার—বিশেষ যাহাকে বানান মুখস্থ করিয়া পড়িতে হইবে! সে স্পষ্টই বলিল, এখনও যদি চেষ্টা করা যায় ত পরির কিছু আশা আছে, কিন্তু সেখানে বই খুলিতে গেলে বিষম গোল বাধিবার আশঙ্কা! আর দুই-এক বছর পরে তাহাকেও কাজের মধ্যে বিব্রত থাকিতে হইবে, তখন পড়াইবার বা পড়িবার অবসর কাহারও মিলিবে না! সুতরাং পরি যে মূর্খ, সেই মূর্খই থাকিয়া যাইবে এবং কাজে-কাজেই

তাহার ভবিষ্যৎ একেবারে শোচনীয়! এই ভবিষ্যতের ভাবনায় তাহার নিজের জীবনটাও বুঝি বা একদম মাটী হইয়া যায়!

ফুলি কহিল,—তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে? যদি পাশ করতে না পারো, তাহলে আমাদের দুই বোনের আর মুখ থাকবে না কিন্তু। জানোই ত, মার একেবারে ইচ্ছে ছিল না, বিয়ে দিতে।

রোগীর মুখের হাসির মতই সুবোধ ম্লান হাসি হাসিল, কহিল,—সে এক রকম হচ্ছে, মন্দ নয়। মোদ্দা, তুই এখানে কদ্দিন আছিস্ এবার?

—বোধ হয়, মাস দুয়েক থাকতে পাব। ফাগুনের শেষে আমার শাশুড়ী তীর্থ থেকে ফিরে আমাকে নিয়ে যাবেন।

—তাহলে—

কি, তাহলে? কথাটা সুবোধের মুখে বাধিয়া গেল। ফুলি বুঝিয়া লইল। সে কহিল,—বৌদিকে আনাব, মাকে বলে? দিদিও নেই, না হলে একলাটি এ একমাস থাকি কি করে! বৌদি এলে তবু একজন সঙ্গী পাব। কিন্তু তোমায় একটা কথা দিতে হবে, এবার তুমি পাশ করবে, বল, আর বৌদির সঙ্গে দিনের বেলায় মোটে দেখা-শোনা হবে না!

সুবোধ অবাক্ হইয়া ফুলির পানে চাহিল। সেও এমন কঠিন কথা কয়! ফুলি দাদার ভাব বুঝিয়া হাসিয়া কহিল, —তা বলে কি দিনের বেলা মোটেই দেখা হবে না? তা নয়। তবে এগজামিনের আগে খুব কম, সে—কচিৎ! কি বল?

সুবোধ তখন মরিয়া হইয়া ভগ্নীকে বুঝাইল, এই যে বাঙালীর দাম্পত্য জীবনে এত দুঃখ—এতটুকু কাব্য নাই, সরসতা নাই—

এ শুধু এই বর্ব্বর প্রথার ফলেই। কেন, স্ত্রীর সহিত দিনের বেলায় দেখা হইলে কি এমন অপরাধ হয়? সেই কখন্ রাত্রে সকলে শয়ন করিলে নিভৃত অবসরে মুখর নূপুর খুলিয়া ফেলিয়া স্ত্রী নিতান্তই নীরব গতিতে স্বামি-সম্ভাষণে আসিবে! এ প্রথা যে নেহাৎ কুৎসিত, অত্যন্ত বর্ব্বর, সমস্ত নারীজাতির প্রতি দারুণ অসম্মান যে এ প্রথায় স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে, তাহারও ইঙ্গিত দিতে সে ছাড়িল না। রাত্রে উভয়ের কতটুকু পরিচয়ের সম্ভাবনা! সংসারের সহিত সারাদিন সংগ্রাম করিয়া দুখানি হৃদয় যখন একান্ত শ্রান্ত, বিশ্রামের কোলে মাথা রাখিবার জন্য ব্যাকুল, তখন তাহারা আপনাদের স্ফুটনোন্মুখী সাধ-আশার কতটুকু পরিচয় পরস্পরকে দিতে পারে! সে ক্ষুদ্র অবসরে কতটুকুই বা তাহা সম্ভব হয়! ইহার ফলেই এক সংসারে বাস করিয়াও দুইটি প্রাণী চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক থাকে, সহানুভূতির এক তারে হৃদয় দুটি বাঁধা পড়ে না, প্রাণের পরিচয়ও চির-অসম্পূর্ণ রাহয়া যায়। কাজেই ভবিষ্যৎ জীবনে বাঙালীর অশান্তির আর সীমা থাকে না।

এই দীর্ঘ বক্তৃতায় দাদার মনের সবটুকুই ফুলির চোখে ধরা পড়িয়া গেল। অহরহ এক তীব্র ব্যাকুলতায় দাদা যে ছট্‌ফট করিতেছে, তাহা সে বুঝিল। আরো বুঝিল, দূরে থাকিয়া দাদার মনের দ্বারে বৌদি এমন ঠাঁইজোড়া আসন পাতিয়া বসিয়া আছে যে বেচারা মার্টিনো-সেক্সপীয়র মনের মধ্যে ঢুকিতে আসিয়া দ্বারের সম্মুখে বধূকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে মাথা নীচু করিয়া পলাইয়া যায়! দাদার পাশের জন্য তাহার ভাবনা হইল, নৈরাশ্যে দুঃখও যে না হইল, এমন নয়!

কিন্তু তাহার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ! কাব্যটুকুও তাহার জীবনে এতদিনে খিতাইতে পারিয়াছে। জীবনের গদ্য ও পদ্য—দুইটা দিকই সে এখন বুঝিত ভাল। তাই মাকে ধরিয়া ফাল্গুনের প্রথমেই বৌদিকে আনাইয়া ফেলিল। সুবোধ পূর্ব্বাহ্নেই একখানি বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ সংগ্রহ করিয়াছিল।

বহির্জগৎ তখন হিম-জর্জ্জর শীতের শেষে নব বসন্তের অপরূপ শ্যাম শোভায় ভরিয়া উঠিতেছে। পাখীর গানে, ফুলের গন্ধে, নবপল্লবের চিক্কণ বর্ণে চারিধার উজ্জ্বল। সুবোধের হৃদয়-রাজ্যেও নব বসন্ত দেখা দিল। রঙীন ফুলে প্রাণটা রাঙিয়া উঠিল, রাজ্যের কোকিল-শ্যামা সেখানে গান ধরিল। দ্বিতীয়ভাগের ঐক্য-বাক্য-মাণিক্যের বানান-গুলাতেও প্রতি বাত্রে অজস্র হীরা-মাণিক্য ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। চারিদিকে ফাল্গুন জাগিল!

সারাদিন গারদের কয়েদীর মতই বড় বড় বইয়েব আড়ালে হাঁফাইয়া মরিতে হয়—কিন্তু সে কষ্ট কষ্ট বলিয়া তাহার মনেও হয় না। কারণ এই দীর্ঘ গদ্যময় দিনের পর যে রাত্রি আসে, তাহা পদ্যের মিলে ভরা! যেমন বিচিত্র সে পদ্যের ছন্দ, তেমনই মধুর তাহার ভাব।

কিন্তু দুই নৌকায় যাহারা পা দিয়া চলে, তাহাদের যেমন তলাইয়া যাইতে বিলম্ব হয় না—সুবোধেরও সেই দশা ঘটিল। গদ্য ও পদ্যের মাঝে পড়িয়া সেও একদিন তলাইয়া গেল, অর্থাৎ সেবার বি. এ পরীক্ষার ফল বাহির হইলে গেজেটে সুবোধের নামটা কেহ খুঁজিয়া পাইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফেলের খবরে বোনেরা দুঃখ করিয়া চিঠি লিখিল, শ্বশুর সান্ত্বনা দিলেন, আশা দিলেন; মা কিন্তু ভাল-মন্দ কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার এই মৌন তিরস্কার সুবোধের গায়ে কাঁটার মত বিঁধিল। ইহার চেয়ে মা যদি কতকগুলা রূঢ় ভর্ৎসনা করিতেন, তাহা হইলে তাহার নিজের মনের সঙ্গে সে একটা বোঝা-পড়া শেষ করিয়া ফেলিতে পারিত। বৃষ্টি ও ঝড় প্রচণ্ড হইলেও সহা যায়, গুমট একেবারেই অসহ্য।

যেদিন ফেলের খবর আসিল, সে-রাত্রে যথাসময়ে শয়নকক্ষে ঢুকিয়া সুবোধ দেখে, পরি বালিশে মুখ গুঁজিয়া বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। সে নিতান্ত অপরাধীর মত তাহার কাছে গিয়া বসিল, ও গলাটাকে যথাসম্ভব কাঁপাইয়া ডাকিল, —পরি।

পরি মুখ তুলিয়া কহিল,—যাও, কেন তুমি ফেল হলে? পরি কাঁদিয়া ফেলিল।

এত দুঃখেও সুবোধের হাসি পাইল। সে কহিল,—ইচ্ছে করে ফেল হই নি!

—তবে কেন হলে?

এ কেন'র জবাব দেওয়া কঠিন। সুবোধ কহিল,—থাক্, যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে ভেবে আর কি হবে? এখন তোমার বই আর খাতা নিয়ে এসো।

পরি আঁচলে চোখ মুছিয়া অভিমানের সুরে বলিল,—না, আমি

কথ্খনো পড়ব না, কখ্খনো না—যতদিন না তুমি পাশ হবে।

সুবোধ কহিল,—সে ত এখন পূরো এক বছরের কথা। এই এক বচ্ছর তুমি বই খুলবে না, মোটে ?

—না।

এ 'না'র অর্থ সুবোধ বুঝিত। পরি একবার যেটাতে 'না' বলিত, সেটাতে তাহাকে 'হাঁ' বলানো বড় কঠিন। সুবোধ ভাবিল, এই সুদৃঢ় 'না'র পিছনে নিশ্চয় আর কাহারও নেপথ্য-ইঙ্গিত আছে! সে কহিল,—মা কি বললে ?

পরি কহিল,—কিছু না। ও বাড়ীর গিন্নি বলছিল, তাই ত অমুক ফেল হল! তা মা বললেন, তিনি ত আর পড়া গিলিয়ে দিতে পারেন না। এখন ও বড় হয়েছে, যা ভাল বোঝে, করবে।

—হুঁ—বলিয়া সুবোধ বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। পরি কহিল,—কি ভাবছ ?

সুবোধ কহিল,—আমি ফেল হয়েছি বলে আমার উপর তোমাদের খুব ঘৃণা হয়েছে, না ?

এই ঘৃণা কথার অর্থটা পরি ঠিক আয়ত্ত করিতে পারিল না, তাই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিরুত্তরেই স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

সুবোধ কহিল,—বল—

পরি বলিল,—আমার মনে বড্ড কষ্ট হয়েছে। শুনেছি, ঠাকুর-জামাইয়েরা কখনও ফেল হন্‌নি। আর তুমি ফেল হলে!

সুবোধ কহিল,—আমি একা নই, আমার মত আরো ঢের হতভাগা ফেল হয়েছে।

পরি এমন ভঙ্গীতে সুবোধের দিকে চাহিল যে সুবোধের মনে হইল, কথাটা পরি বিশ্বাস করে নাই! স্বরে একটু ঝাঁজ দিয়া পরি বলিল,—আমায় পড়বার জন্যে বকো—নিজে ত এই পড়া বলতে পার না!

কথার হুলটা সুবোধের বুকে বিঁধিল। ঘরে ঢুকিয়া পরির চোখে জল দেখিয়া সে অনেকখানি আনন্দ পাইয়াছিল—এমন প্রাণ-ভরা সমবেদনা ঘরের কোণে সঞ্চিত থাকিলে হাজার বার সে পরীক্ষায় ফেল হইতে পারে—কোন দুঃখ নাই! ফেল হইয়া সে ভাবিয়াছিল, রাত্রে আজ আপনার নিভৃত গৃহের কোণটিকে করুণ রসের দিব্য অভিনয় জমাইয়া তুলিবে। পরির চোখের জল তাহার আভাষও বেশ দিয়াছিল! কিন্তু এই শ্লেষ—তাহার অক্ষমতায় এই বিদ্রূপ! না, ও অশ্রু তবে কপট,—তাহার কোন মূল্যই নাই! হায়!

ইতিমধ্যে ফুলি একদিন বেড়াইতে আসিয়া দাদাকে গোপনে বলিল, এবার ভাল করিয়া পড়িয়া তাহাকে পাশ করিতেই হইবে। ঘরে-বাহিরে সকলে বধূকেই নিন্দা করিতেছে—এতদিন তবু সে যা-হোক ঠুকঠুক করিয়া পাশ করিয়া আসিতেছিল ত, আর যেই বৌ আসিল—

সুবোধ ফোঁস করিয়া উঠিল,—লোকের এ অন্যায়! বৌ ত আর আমার বই কেড়ে রাখেনি!

ফুলি কহিল,—মা বলছিল, মা আর কোন কথায় থাকবে না। লেখাপড়ার সম্বন্ধে কিছু বলবেও না।

সুবোধ স্থির করিল, আর সে অন্দরে ঢুকিবে না, পরির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও করিবে না—এবং এই সকল কঠোরতা

অবলম্বন করিয়া আবার ফেল হইয়া দেখাইবে যে বধূর সহিত এ ব্যাপারের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই! পরমুহূর্ত্তেই আবার তাহার মনে হইল, ফেল হইয়া ফল কি! কেহ ত তাহার দুঃখে সহানুভূতি জানাইবে না ঘৃণায় লজ্জায় নিজেই সে মাটি হইতে থাকিবে! তাব চেয়ে—বেশ, শুধু সে বই লইয়াই একটা বৎসর পড়িয়া থাকিবে, বউয়ের ত্রিসীমা মাড়াইবে না। ফুলি কহিল,—এবার ভাল করে পড়বে ত?

সুবোধ কহিল,—এবার পাশ করবই। না পারি, সংসার ত্যাগ করব।

এই সব বৈরাগ্যের বক্তৃতা ফুলির যেন বিষ বোধ হইত। সে আর কিছু না বলিয়া বৌদিকে কি কতক-গুলা উপদেশ দিতে চলিয়া গেল।

সুবোধ কঠোর হইল। জীবনটা শুধুই গদ্য, যতিহীন, ছন্দহীন গদ্য! এই গদ্যেব চাপেই সে আপনার প্রাণের পদ্যটুকুকে পিষিয়া চূর্ণ করিবে। এই পাশেব ফাঁস লাগাইয়া জীবনের যা কিছু মাধুরী, সব সে হত্যা করিবে!

রুটিনে সে আপনাকে বাঁধিয়া ফেলিল। পড়া,—আর পড়া! সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবাব শুধু গড়ের মাঠে বেড়াইতে বাহির হয়—রাত্রে সকলে শয়ন করিলে যখন সে বই মুড়িয়া শয্যায় আসিয়া আশ্রয় লয়, তখন পরি নিদ্রায় অচেতন! বাতাসে তাহার সুন্দর মুখে অলকগুচ্ছ উড়িয়া পড়ে, কখনো বা জ্যোৎস্নায় সে মুখ অপূর্ব্ব রমণীয় দেখায়, সুবোধ নির্নিমেষ নয়নে সে শোভা নিরীক্ষণ করে। তাহার বুকের মধ্যে চঞ্চল রক্তস্রোত তোল-পাড় করিতে থাকে, কিন্তু সজোরে আপনার মনকে চাবকাইয়া

সে এই দুর্ব্বলতাটুকুকে তাড়াইয়া দিয়া একেবারে অন্তদিকে পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়ে। মাঝে মাঝে ক্ষোভে তাহার সারা চিত্ত টন্‌টন্‌ করিয়া ওঠে। তাহার এই মৌন অভিমান পরির চিত্তে এতটুকু চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি করে না! সাধিয়া সে নিজে কোনদিন সোহাগ করিতে আসে না! তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, সে যেন বর্ত্তাইয়া গিয়াছে! হায়রে, এত বড় দুঃখ সংসারে থাকিয়া কে কবে সহ্য করিয়াছে!

তবুও থাকিয়া থাকিয়া তাহার দুর্ব্বল মন কাঁপিয়া ওঠে! মাঠে বেড়াইতে গিয়া সে যখন দেখে, ইংরাজ প্রেমিক-প্রেমিকা হাতে-হাতে মালা গাঁথিয়া প্রাণে অপরূপ কাব্য ফুটাইয়া ধীর-মন্দ গমনে বেড়াইতেছে, তখন আপনার দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া সে আগুন হইয়া ওঠে। সব থাকিয়াও তাহার কিছু নাই! আহা, ইহাদেরই জন্ম সার্থক—জীবনের মূল্য ইহারাই শুধু বুঝিয়াছে! আর অধম বাঙালী তরুণ বয়স হইতেই কাব্যের পুষ্পময় পথটাকে দূরে রাখিয়া ভীষণ গদ্যের পথে জীবনটাকে ছিঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে!

সেদিন মন তাহার অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। মাঠে বন্ধু সুরেশের সঙ্গে দেখা হইল। স্ত্রীকে লইয়া মাঠে সে প্রায়ই বেড়াইতে আসে। জ্যোৎস্নায় চারিধার যখন ভরিয়া যায়, দুই জনে তখন একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়ে। স্ত্রী বনলতা মৃদু কণ্ঠে প্রেমের গান গায়—আর তাহারই কোলে শ্রান্ত শির রাখিয়া সুরেশ স্বপ্নলোকে উধাও হইয়া যায়! স্ত্রীকে লইয়া এই বয়সে

জীবনের কাব্যটুকু যদি উপভোগ করা না গেল ত, এ বয়স, আর এ শোভার সৃষ্টি হইয়াছিল কেন!

ঠিক! সুবোধ ভাবিল, না, ছুটি চাই, একদিন ছুটি। পড়ার চাপে প্রাণটা যে গুঁড়াইয়া ধূলা হইয়া গেল! সে স্থির করিল, পরিকে বলিয়া-কহিয়া রাজী করাইয়া একদিন সে মাঠে আনিয়া জীবনের কাব্যটুকু পরিপূর্ণ উপভোগ করিবে। পরিকে সে স্পষ্টই বলিবে, একটা দিন শুধু আমার পানে ফিরিয়া চাও। আবার আমি কেতাবের গহন-বনে ব্রহ্মচারী সাজিয়া প্রবেশ করিব! যদি পরি এ কথা না রাখে? তাহা হইলে? তাহা হইলে সে এমন উৎকট প্রতিশোধ লইবে যে সারা বিশ্ব তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবে!

বাড়ী আসিয়া সুবোধ দেখিল, চাঁদের আলোয় নীচের দালান ভরিয়া গিয়াছে, আর দালানের একধারে জ্যোৎস্নাটুকুকে যেন উপহাস করিয়াই পরি বসিয়া আনাজ কুটিতেছে! মা তাহার পদশব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিয়া কহিলেন,—ওরে, তুই ত এখন পড়াশোনা বেশ করছিস্—আমার চৌকিদারির আর দরকার নেই। বেশ, এমনি করে পড়্ দেখি। তা শোন্, ও বাড়ীর ওঁরা এ জন্মাষ্টমীতে জগন্নাথ দেখতে যাচ্ছেন। আমিও যাই ওদের সঙ্গে! কি বলিস?

সুবোধ ভাবিল, বাঃ, চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছে ত! প্রথমে একটু অনুযোগের সুর তুলিয়া মাকে সতর্কতার উপদেশ দিয়া সহজেই সে রাজী হইয়া গেল। মা খুসী হইয়া বলিলেন, —এখানকার সব গোছ-গাছ আমি করে যাচ্ছি। বৌমা শুধু ভাঁড়ার বের করে দেবে, তরকারীগুলো কুটে দেবে—বামনীই

সব দেখে-শুনে নেবে'খন। কোন কষ্ট হবে না। আমি তিন দিনের মধ্যেই ফিরব। কাল রাত্রের গাড়ীতে যাব—তা কাল হলো শনিবার—আবার সোমবার রাত্রে বেরিয়ে মঙ্গলবার সকালে এখানে এসে পৌছুব। কোন ভাবনা নেই।

মা চলিয়া গেলে পরিকে নিজের মতে আনিতে বেশী বেগ পাইতে হইল না। সুবোধ বুঝাইল, একটা দিন শুধু সে ছুটি চায়! ইহার পর পড়ায় মনটাকে আরও বেশী করিয়া সে লাগাইতে পারিবে। পরি বই ছাড়িয়া বাঁচিয়া ছিল, তাহাকে যে আবার ঘুম-চোখে দ্বিতীয় ভাগের বানান মুখস্থ করিতে হইবে না, ইহাতে সে বর্ত্তাইয়া গেল। এ প্রস্তাবে সে রাজী হইল।

রাত্রি দশটার সময় বাড়ীর সকলে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বিছানায় শুইলে সুবোধ চুপি চুপি যাইয়া একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিল। বাড়ীর একটু দূরে গাড়ী রাখিয়া সে পরির হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিল। গাড়ী সদর্পে গড়ের মাঠের দিকে ছুটিল।

গাড়ীতে বসিয়া মাঠ প্রদক্ষিণ করিয়া পরে পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে গাড়ী রাখিয়া সুবোধ পরিকে লইয়া মাঠে চলিল। গভীর রাত্রি। কোথাও কেহ নাই, তবুও পরির পা জড়াইয়া যাইতেছিল। মুখের ঘোমটা দীর্ঘভাবে টানিয়া সুবোধের হাত ধরিয়া সে একরকম ঝুলিয়াই মাঠে চলিল। সুবোধের বুকের মধ্যে কে যেন ধড়াস্ করিয়া মুগুরের ঘা মারিতেছিল। গাড়ী হইতে দূরে আসিয়া গাটাও একবার একটু কাঁপিয়া উঠিল।

উভয়ে একখানা বেঞ্চে আসিয়া বসিল। চারিধারে বড় বড় গাছ ছায়া-নিবিড় কুঞ্জ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। পাতায়-ঢাকা

শাখায় দুই-একটা পাখী তখনও ডানাঝাড়ার ঝট্-পট্ শব্দ করিতে-ছিল। সুবোধ কহিল,—মাঠের মধ্যে আবার এতখানি ঘোমটা দিলে কেন? কে আছে এখানে? ছি!

পরি কহিল,—না বাবু, আমার ভয় করে। এ কোথায় এসে বস্‌লে! তার চেয়ে গাড়ী করে বেড়ালেই ত চল্‌ত! চল, বাড়ী যাই।

সুবোধ হাসিয়া কহিল,—বাঃ, আমি রয়েছি, ভয় কি!

কিন্তু সুবোধেরও যে একটুও ভয় হয় নাই, এমন নয়। কিছুকাল পূর্ব্বে ষ্টার থিয়েটারে সে বাবু প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছিল, তাই সে ভাবিতেছিল, হঠাৎ যদি একটা মাতাল গোরা কোন দিক হইতে আসিয়া পড়ে! ঐ ত কেল্লা! পথ হইতে এতটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছে! তাই ত! ডাক দিলে কেহ সাড়াও পাইবে না যে! এই রাত্রে এত দূরে আসিয়া বসা ঠিক হয় নাই। স্তব্ধ বিজন মাঠ! তাহার উপর আকাশে চাঁদ নাই—খণ্ড মেঘগুলা ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। সুদূর পথ হইতে গ্যাসের আলোগুলা শুধু ঈষৎ সঙ্কোচে চোখ মেলিয়া এই তরুণ বাঙালী দম্পতীর অপূর্ব্ব প্রেমলীলার অভিনয় দেখিতেছে!

সুবোধে পরির হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—এসো একটু বেড়াই।

পরির সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, ভয়ে জিভ শুকাইয়া আসিয়াছিল, তাহার মুখে কোন কথা সরিল না। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দূরে বির্জ্জিতলার গির্জ্জার ঘড়িতে ঢঙ্ করিয়া একটা বাজিল। সুবোধ কহিল,—একটা! এস তবে, গাড়ীতে উঠি।

পথের ধারে কিন্তু গাড়ীর দেখা মিলিল না। সুবোধের রাগ হইল। ষ্ট্যাণ্ডেও আর একখানা গাড়ী নাই! সে তখন প্রমাদ গণিল। তাই ত, উপায়? হাঁ, এক উপায় আছে! ধর্ম্মতলার দিকে অগ্রসর হইলে গাড়ী মিলিতে পারে। সুবোধ তখন পরিকে লইয়া ধর্ম্মতলার দিকে চলিল।

মিউজিয়মের সম্মুখে এক বিপদ ঘটিল। পুলিশের এক জমাদার আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। কে তাহারা? এত রাত্রে মাঠের ধার দিয়া কোথায় চলিয়াছে? কৈফিয়ৎ চাই! জমাদারের কঠোর স্বরে পরি ভয়ে কাপড়ের আবরণের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। সুবোধ কম্পিত কণ্ঠে পরিচয় দিল—এবং এ পথে আসিবার উদ্দেশ্যও কতক বাদ-সাদ দিয়া খুলিয়া বলিল।

পাকা লোক বলিয়া জমাদারের মনে একটা অহঙ্কার ছিল। সে হাসিয়া বলিল,—এত বছর সে পুলিশে চাকরি করিতেছে—স্ত্রীকে লইয়া মাঠে বেড়াইতে কোন বাঙালী ভদ্রলোককে এত রাত্রে কখনও সে চক্ষে দেখে নাই। সে স্পষ্টই বলিল, তাহার সন্দেহ হইয়াছে; এবং উভয়কেই সে থানায় লইয়া যাইবে!

ভূমিকম্পের বেগে পৃথিবীখানা দুলিয়া উঠিল। থানায় যাইতে হইবে? কেন! সে কি চোর না বদমায়েস!

জমাদার হাসিয়া বলিল, এত রাত্রে স্ত্রীকে কাপড়ে মুড়িয়া পথে হাওয়া খাইয়া বেড়ানোর কেশ সে আরও দুই-চারিটা করিয়াছে। তাহার চোখে ধুলা দেওয়া সহজ নয়। যে-সব বাবু স্ত্রীকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হয়, তাহারা এত রাত্রি অবধি মাঠে থাকে না, তা ছাড়া তাহাদের স্ত্রীর পায়ে জুতা থাকে এবং এতখানি আবরণেরও তাহাদের

প্রয়োজন হয় না। এ জ্ঞানটুকু খোট্টা হইলেও চাকরির কল্যাণে তাহার বিলক্ষণ আছে।

সুবোধ জ্বলিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, এক চড়ে এই বর্ব্বরটার দাঁতের পাটি সে উড়াইয়া দেয়। তাহার এ কুৎসিত সন্দেহেরও তাহা হইলে সমুচিত শাস্তি হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা সমাচীন বলিয়া মনে হইল না। সঙ্গে পরি আছে—এখনই তাহা হইলে একটা হুলস্থূল বাধিয়া যাইবে···আর কাল বাঙলা খবরের কাগজে অমনি চী-চীৎকার বাধিবে। থানা-গারদ-আদালতের ভীষণ ছবিও চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল।

তবে এ বিপদে সুবোধ একেবারে যে ধৈর্য্য হারাইল না, তাহার প্রধান কারণ, জমাদারটা কথা বলিতেছিল হিন্দীতে, পরি সে ভাষা মোটেই বোঝে না। সুবোধ জমাদারকে কহিল,—বেশ, সন্দেহ হয়, আমার বাড়ীতে এস, তদন্ত কর।

জমাদার কহিল, থানায় গিয়া আগে কেশ লিখাইতে হইবে, পরে কোন ইন্‌স্পেক্টর হুকুম দিলে তদন্ত হইবে। রাত্রি বারোটার পর যে সব কেশ ধরা পড়ে, তাহার রিপোর্ট একদিন পরে করিতে হয়। সুতরাং তদন্তের তেমন জরুরি প্রয়োজন নাই।

এমন সময়—ক্যা হুয়া ?—বলিয়া এক সাহেব ইন্‌স্পেক্টর সেই স্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। জমাদার তাহার সন্দেহের কথা খুলিয়া বলিল। সুবোধও সাফাই দিল, সে ভদ্রলোক, স্ত্রীকে লইয়া মাঠে বেড়াইতে আসিয়াছিল—স্ত্রী পর্দ্দানশীন, পথ জনহীন না হইলে মাঠে আসিতে চায় না—তাই এত রাত্রি হইয়াছে। গাড়ী করিয়াই সে আসিয়াছিল। এখন গাড়োয়ান ফেরার, কাজেই এ দুর্দ্দশা!

ইন্‌স্পেক্টর একটী চকিত দৃষ্টিতে সুবোধের আপাদ-

মস্তক দেখিয়া লইল, ও জমাদারকে গাড়ী আনিবার আদেশ দিয়া সুবোধকে বলিল,—আপনার ভয় নাই! আমি এখান হইতে এখনই আপনার বাড়ীতে যাইব—থানায় যাইতে হইবে না। যদি সন্তোষজনক প্রমাণ পাই, তাহা হইলে কোন গোলযোগেরই আশঙ্কা নাই! পরে বস্ত্রাবৃতা পরির পানেও মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া কহিল,—I sec, you arc a gentleman, and the lady, oh she is a decent lady. I do not suspect her.

জমাদার দুই পা আগাইয়া যাইতেই এক চলন্ত গাড়ীর দেখা পাইল। তখনই সে তাহাকে দাঁড় করাইল। গাড়োয়ান কহিল, সে এক বাবুকে লইয়া মাঠে আসিয়াছে; পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে সে দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় দুইটা মাতাল সাহেব আসিয়া জোর করিয়া তাহার গাড়ীতে সওয়ারি হইয়া সেগেছিয়া অবধি তাহাকে দৌড় করাইয়াছে, ভাড়াও দেয় নাই। কে জানে, বাবু এখন মাঠে আছেন কি না!

জমাদার তাহাকে ছাড়িল না—টানিয়া ইন্‌স্পেক্টরের কাছে আনিল।

সুবোধ ও পরিকে দেখিয়া গাড়োয়ান তখনই চিনিতে পারিল, কহিল,—এই সে বাবু—

গোলটা তখন সহজেই মিটিয়া গেল। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব সুবোধের কাছে মাপ চাহিয়া, লেডির কাছে মাপ চাহিয়া জমাদারকে ভর্ৎসনা করিল। আরও বলিল, পুলিশের এই সন্দেহ করা রোগটুকু কত সময় যে নিরীহ ভদ্রলোককে বিপন্ন করিয়া তোলে, তাহার আর ঠিকানা নাই। তবে উপায়ও নাই! মেষের চর্ম্ম গায়ে দিয়া সমাজের পথে বিস্তর হিংস্র পশুও দিবারাত্রি ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে—তাহাদের জন্তই না এতখানি সতর্কতা! কাজেই পুলিশের সন্দেহ-রোগও সারিতে পারে না। জমাদারের আর দোষ কি? তবে ভাগ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই এত সহজে সব মিটিয়া গেল। নহিলে থানা অবধি বাবুর টান পড়িত! সঙ্গিনীটি যে বাবুর বিবাহিতা স্ত্রী, পুলিশে তাহার দস্তুরমত প্রমাণ দিতে হইত! যদিও ইহাতে ভয়ের কিছু ছিল না, কারণ হারা চিরদিনই হারা—তবে দুঃখ শুধু এই যে 'লেডি' কি মনে করিলেন! যাগ্‌গে হোক বাবু, All's well that ends well.

সাহেবের করমর্দ্দন করিয়া সুবোধ গাড়ীতে উঠিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। গাড়ী চলিলে পরিও মুখের ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া বলিল,—হ্যাঁ গা, ওরা পুলিশের লোক, বুঝি? খুব ভাল ত! নিজে থেকে গাড়ী করে দিলে! কিন্তু যাই বল, আর কখনও আমি তোমায় সঙ্গে রাত্রে বেরুচ্ছি না বাবু, এত লোকের সামনে বে-আব্রু, ছি!

সুবোধ কোন কথা কহিল না। স্ত্রীর নির্ব্বুদ্ধিতায় এই প্রথম সে খুসী হইল। তাহার মনে হইল, ভাগ্যে পরি কথাগুলা কিছুই বোঝে নাই। বুঝিলে ঐ মাঠের মধ্যেই ধড়াস করিয়া সে হয়ত অজ্ঞান হইয়া পড়িত! তাহা হইলে কি বিপদই না ঘটিত! ওঃ, ভগবান খুব রক্ষা করিয়াছেন!

কিন্তু সান্ত্বনা সে যতই পাক্, একটা নির্ম্মম সত্যের আঘাত সেই সঙ্গে তাহার বুকে তীক্ষ্ণ ছুরির মতই বিঁধিতেছিল, 'কাব্যং সুদুর্ল্লভং লোকে'—হায়রে, জগতে শুধু গদ্য, ভীষণ গদ্যই গদা উঁচাইয়া আছে, বেচারী পদ্য ঐ কেতাবের পাতার আড়ালটিতেই কোনমতে আত্মরক্ষা করিতেছে!

দুই দিক

ভোর হইতেই ঘরের দ্বার খুলিয়া নীলিমা বাঙলার বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্বদিকে তখন তরুণ উষার আলোয় এমন একটা গোলাপী আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে যে সে রঙের ছটা দেখিয়া নীলিমা মুগ্ধ হইয়া গেল। নির্মল নীল স্বচ্ছ আকাশ! চিরকাল কলিকাতায় বাস করিয়া এমন আকাশের কল্পনাও সে কোনদিন করিতে পারে নাই। মুগ্ধ বিস্ময়ে নীলিমা ডাকিল,—ঠাকুরপো, ও ভাই, শীগ্‌গির এসো এখানে—দেখে যাও!

সে আহ্বানে সতেরো-আঠারো বৎসর বয়সের একটি ছেলে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। চোখে তাহার তখনো ঘুমের ঘোর জড়ানো। বেচারা সবে মাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ চাহিবার চেষ্টা করিতেছিল। বৌদি না জানি কি মজার জিনিষই দেখিতে ডাকিতেছে ভাবিয়া তীব্র আগ্রহে সে বাহিরে বৌদির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—কি ভাই বৌদি?

নীলিমার মন মুগ্ধ বিস্ময়ে তখনো টলমল করিতেছিল। সে কহিল,—কেমন পরিষ্কার আকাশ দেখেচ! আর ঐ পূব দিক থেকে ফিকে গোলাপী রঙের কি সুন্দর আভা ফুটে বেরিয়েছে, ভাখো।

এই দেখিতে ডাকা! বিনয়ের মনটা মুষ্‌ড়াইয়া গেল। তাচ্ছিল্যের স্বরে সে বলিল,—এই! আমি বলি, বৌদি না

জংনি বাঘ দেখেচে, না, ভাল্লুক দেখেচে! ও ত সূয্যি উঠচে, তারি আলো!

নীলিমা বলিল,—তা নয় গো মশাই! এমন আকাশ, এমন আলো তোমার পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে কখনো চক্ষে দেখেচ কোন দিন?

বিনয় হাসিয়া বলিল,—তুমি দেখনি, দেখ। একে ছেলে-মানুষ, তায় আজন্ম কলকাতার ধোঁয়ায় বাস করচ! আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক—সাত-আট বৎসর পাড়াগাঁয়ে কাটিয়েওচি, আমরা ও-আলো ঢের দেখেচি।

নীলিমা বলিল,—ওঃ, কি আমার মাতব্বর মুরুব্বি-মশাই এলেন! বয়সের গাছ-পাথর নেই! উনি ঢের দেখেচেন!

—দেখেচিই ত। জানো বৌদি, ছেলেবেলায় দেশে বাগানে-বাগানে কত আম কুড়িয়ে জাম কুড়িয়ে বেড়িয়েচি! ভোর না হতেই দল বেঁধে সব বেরুতুম—আকাশ এমনি ফিকে লাল্‌চে রঙে ভরে থাকত—! আর শীতকালে ঘাসের উপর শিশির পড়ে ছোট ছোট হীরের কুচির মত কি যে সে জল্ জল্ করত! সত্যি, কি চমৎকারই না দেখতে লাগত! তার পর তোমাদের পাল্লায় পড়ে কলকাত্তাই হলুম, আর চোখের সামনে থেকে সবুজ গাছপালা, নীল আকাশ সব ডুবে গেল। এখানে সকালে মর্নিং-ওয়াকে বেরুলুম যদি ত ময়লা-গাড়ীর হটর হটর, নয় ফস্ ফড় করে উড়ের দল রাস্তায় জল ছিটিয়ে কাদায়-কাদা করে দিচ্ছে! রামচন্দ্র—কলকাতাতেও আবার মানুষে থাকে!

নীলিমা বলিল,—তোমার দাদা ত কলকাতা ছাড়তে বললে প্রমাদ গণেন! এই যে আজ তিন বছর ধরে তাঁকে কত

সাধছি, কলকাতা ছেড়ে বাইরে এক পা বেরুতে পারলেন কি!

বিনয় বলিল,—কি করে বেরুবে বল বৌদি? রূপেয়ার মোহে জগতের সব রূপ যে ঢাকা পড়ে যায়।

নীলিমা বলিল,—ছাই রূপেয়া!

বিনয় হাসিয়া বলিল,—ছাই বলো না। দাদার এই রূপেয়ার জোরেই ত তুমি আজ এখানে এই নীল নির্ম্মল নভোমণ্ডল আর ঊষার রক্তিম আভা দেখতে পেয়েচ।

এ কথায় নীলিমা একবারটি চুপ করিল। অনেক কথাই অমনি তাহার মনে পড়িল। টাকার কথার ইঙ্গিতেই তাহার গায়ে কেমন হুল ফোটে!

সে গরীব কেরাণীর মেয়ে। কলিকাতায় জীর্ণ অট্টালিকার স্যাঁৎসেতে ঘরের মধ্যেই তাহার বালিকা-কাল নিরাড়ম্বরে কাটিয়াছিল! ভগবান অর্থ দেন নাই,—কিন্তু একটা ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলেন, সে রূপ। নীলিমার রূপের খ্যাতি ঐ স্যাঁৎসেতে ঘর ছাড়াইয়া লোকের মুখে মুখে এমন বহুদূর অবধি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে সেই খ্যাতির জোরে অনেক মেয়েকে হারাইয়া এ-বাড়ীর বৌয়ের আসনটুকু পরম আদরে সে দখল করিতে পারিয়াছিল। শ্বশুর-বাড়ীতে এই রূপের গৌরবেই সে চিরদিন গৌরবিনী হইয়া আছে! তাহাকে যে দেখিত, সেই বলিত, হাঁ, রূপসী বটে! গরিব বাপ তাহাকে একখানিও অলঙ্কার দিতে পারে নাই। এখন তাহার সিন্দুক-ভরা অলঙ্কারের রাশি—সে সবই শ্বশুরের দেওয়া, স্বামীর দেওয়া। স্বামী বিজয় তাহার এ রূপে প্রথমটা কেমন বিভোর হইয়াছিল। এই-রূপের পূজারী হইয়া দুই-দুইবার সে

এগ্‌জামিন ফেল করিয়া বসে। তারপর কোথা হইতে কি যে হইল, নীলিমাকে সরাইয়া রাখিয়া বিজয় অবশেষে একদিন বই লইয়া এমন মাতা মাতিল যে তাহার নেশা আর সে ছাড়িতে পারিল না! এখন সে এটর্ণিগিরি করিতেছে—দিবারাত্রি মক্কেল আর আইন-পত্রের কেতাব লইয়াই ব্যস্ত থাকে। রূপসী পত্নী এই তরুণ যৌবনে রূপের পশরা লইয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া থাকে—কোনদিন সে রূপ হয় ত বিজয়ের চোখে পড়ে, আবার কোনদিন তা চোখেও পড়েও না!

আগে তাহার একটা আবদার মুখের কথায় খসিতে না খসিতে বিজয় অমনি তাহা মিটাইবার পথ পাইত না! আর এখন? সহস্র আব্‌দার স্বামীর ঔদাসীন্যের ঘা খাইয়া দারুণ বেদনায় ঝরিয়া মরিতেছে, স্বামী তাহাতে দিব্য অটল! পয়সা যেখানে নাই, স্বামীর মন সেদিকে ঘেঁষ দিতেও জানে না! এই তিন বৎসর ধরিয়া নীলিমা নিত্য স্বামীকে কত সাধিয়াছে,—ওগো, এবার পূজোয় চল না, একবার বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসিগে।—তা সে কথাটা বিজয় গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতে চায় না! হাসিয়া বলে, পাগল! বিদেশে গেলে রোজগার একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। হাওয়া খাবার সময় কোথা, বল? কাজকর্ম্ম সেরে বুড়ো বয়সে যখন অথর্ব্ব হয়ে পড়ব, তখন হাওয়া খেতে যাব। এখন টাকা-রোজগারের সময়—!

টাকা! টাকা! এত টাকায় কাজ কি! ভগবান অভাব ত কিছু দেন নাই—তবুও টাকার এত গোলামি কেন! এই কথাটা নীলিমার মনে সর্ব্বদাই যেন ঝড়ের সুরে গর্জ্জন করিতে থাকে! এমন ত নয় যে, দুইদিন একটু বিশ্রাম লইলে বাড়ীতে সব না খাইয়া মরিবে!

সেবারে পূজার ষষ্ঠীর দিন ঠিক সন্ধ্যাবেলায় সোনালি জরির বোনা খুব দামী একখানা বেনারসী শাড়ী আনিয়া নীলিমার হাতে দিয়া বিজয় বলিল,—পাঁচ হাজার টাকার কাজ করা গেল, নীলি, তোমার ভাগ্যে। এই শাড়ী তাই তোমায় নজর দিচ্ছি। সুন্দর মানুষ, এ শাড়ীতে তোমায় খাসা মানাবে—! যেন হেম-জড়িতা দামিনী!

এ কথায় নীলিমার দুই চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিয়াছিল। এ সাজ কাহার জন্যই বা করিব? তুমি কি দেখিবে? আমি যদি তোমার রূপসী ভার্য্যা না হইয়া রূপেয়া-ওয়ালা মাড়োয়ারী মক্কেল হইতাম, তবেই আমার আদর হইত তোমার কাছে! আবার ঠাট্টা করিয়া কবিত্ব হইতেছে, হেম-জড়িতা দামিনী! এটুকুও প্রথম মিলনের সেই কাব্য-চর্চ্চারই স্মৃতি—কি নিষ্ঠুর স্মৃতি!

নীলিমাকে গম্ভীর নিরুত্তর দেখিয়া বিজয় বহিল,—কি, কথা নেই যে! এ নজরে তুষ্টা নও, রুষ্টা প্রিয়তমা?

ঝড়ের একটা ঝাপটার মতই নীলিমা বলিয়া উঠিল—না।

বিজয় বলিল,—বেশ, কি চাও, বল? তোমার ভাগ্যেই যখন এ টাকা পেয়েচি, তখন যাতে তোমার তৃপ্তি হয়—! জানো না, লোকে বলে, স্ত্রীভাগ্যে ধন!

নীলিমা বলিল—ছাই ভাগ্যি! এর চেয়ে একটা জিনিষ দাও দিকি, যা বলি,—

বিজয় বলিল,—কি জিনিষ?

নীলিমা বলিল,—পশ্চিমে চল না গো একবার, লক্ষ্মীটি, তোমার দুই পায়ে পড়ি। রেলগাড়ী চড়ে চারধার একবার দেখে নি—

জগৎ-সংসারে কোথায় কি আছে! লোকের মুখে কত গল্পই শুনি—কবে শেষ মরে যাব, তখন তোমারো আপশোষ হবে, তা কিন্তু বলে রাখচি!

এ কথায় বিজয় শুধু ছোট্ট একটু নীরস জবাব দিয়াছিল। সে বলিয়াছিল,—পাগল! কার সঙ্গে যাবে?

—কেন, তোমার সঙ্গে।

—তা হয় না, নীলি। আমার যাওয়া হয় না। এখানে পঞ্চাশ রকমের কাজ। ব্যবসার এই উঠতি-মুখে গর-হাজির থাকলে কোথায় শেষে তলিয়ে যাব!

আবার সেই টাকা! আঃ!

নীলিমা আর সে কথা তোলে নাই। তাই এবার দেবর বিনয়ের সঙ্গে পরামর্শ আঁটিয়া সে এমন নাছোড়বন্দা হইয়া পড়িয়াছিল,—বিনয়ও বায়না লইয়াছিল। কাজেই বিজয় বাধ্য হইয়া তাহাদের দুইজনকে মিহিজামে পাঠাইয়াছে। মিহিজামে এক মাড়োয়ারী মক্কেলের বাড়ী আছে ষ্টেশনের কাছে,—কুঞ্জ-কুটীর। একমাস এখানে থাকিয়া নির্বিবাদে হাওয়া খাইয়া লও। বিজয় কথা দিয়াছে, তাহাদের ফিরিবার সময় একটা রাত্রি এখানে আসিয়া সে বাস করিয়া যাইবে।

২

রেলোয়ে ষ্টেশন, ট্রেণ, সন্ধ্যার সেই ঝাপ্‌সা আলো-আঁধারের মধ্য দিয়া যাত্রা—এ সব নীলিমার কেমন স্বপ্নের মত মনে হইতেছিল। গাড়ীতে চড়িয়া সেই যে সে জানলাটির ধারে বসিয়া বাহিরের

পানে তাকাইয়াছিল—তেমনি একাসনে বসিয়াই সে বরাবর মিহিজামে আসিয়াছে। রিজার্ভ-কামরায় দেবর কত তামাসা করিয়াছে, দুই চোখে অবিরল কয়লার গুঁড়া পড়িয়া চোখ কর্‌কর্‌ করিয়াছে, দুই চোখ রগড়াইয়া জল বাহির করিয়া তবুও সে ঠায় ঐ জানলার ধারটিতেই বসিয়া বাহিরে দিকেই চাহিয়াছিল! একটু নড়ে নাই!

তারপর বাঙলায় আসিয়া যখন পৌঁছিল, তখন রাত্রির অন্ধকারে চারিধার ভরিয়া গিয়াছে। কিছুই দেখা যায় নাই। শুধু ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে মাঝে মাঝে ঐ বড় আলোগুলা, আর পথে চলন্ত পথিকের হাতে টিম্‌টিমে গোটাকতক ল্যাম্প জোনাকির মত নড়িয়া নড়িয়া জ্বলিতেছে—সবটা আগাগোড়া যেন স্বপ্নের মত! রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাল করিয়া সে ঘুমাইতে পারে নাই কেবলি ভাবিয়াছে, কখন্ সকাল হইবে, দিনের আলোয় পশ্চিমের পথ-ঘাট গাছ-পালা কেমন, তাহা সে চক্ষে দেখিবে!

তাই ভোর হইবামাত্র সে অস্থির চিত্তে বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দাঁড়াইয়া চারিধারের যে দৃশ্য চোখে পড়িল, তাহাতে সে একেবারে বিভোর হইয়া উঠিল। বাঙলাখানিও চমৎকার। সামনে মস্ত বাগান, লাল-নীল নানা রঙের ফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া রাখিয়াছে। এই মুক্ত কাননে ফুলের রাশি —জীবনের কি হিল্লোলই না বহিয়া চলিয়াছে! ইহার কাছে কলিকাতার বাড়ীর টবের গাছেরসেই ফুলগুলা, সে যেন চাঁদের কাছে হারিকেনের আলোর মতই,—তেমনি ম্লান, তেমনি নির্জীব!

নীলিমা বলিল,—চল না ভাই ঠাকুরপো, একটু বেড়িয়ে আসি।

বিনয় বলিল,—যাব। ধাঁ করে এক পেয়ালা চা আমায় আগে খাওয়াও দিকি, আর কালকের সে কলকাতার বাসি লুচিও কিছু পড়ে আছে না? দাও তো, খেয়ে নি। তুমিও কিছু খাও। তারপর এসো, টক্কর দিয়ে বেড়াতে বেরুই,—কে কত হাঁটতে পারে, দেখা যাবে।

বিনয় মুখ-চোখ ধুইতে চলিয়া গেল; নীলিমাও অধীর আগ্রহে ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল গরম করিতে বসিল।

তার পর চা খাওয়া হইলে দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইল। সরল পথ। দুইধারে বাগান, কুটীর—ঐশ্বর্য্যের কোন আড়ম্বর নাই। প্রকৃতির কোলে নয়ন-মনের তৃপ্তিকর এমন রাশি রাশি ছবি ছড়ানো রহিয়াছে! দূরে মাঝে মাঝে ধূম্র পাহাড়। পাহাড়ের কোলে সূর্য্যের রক্ত ছটা! পল্লী ছাড়াইয়া পথের দুইধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কোথাও খাদ। খাদে লতাগুল্ম,—কি বিচিত্র তাদের আকার আর বর্ণ! দুই-জনে গল্প করিতে করিতে অনেক দূর বেড়াইয়া আসিল।

বাড়ী আসিয়া নীলিমা বলিল,—বিকেলে আবার যাব ভাই, কেমন?

বিনয় বলিল,—ধাপে ধাপে ওঠো বৌদি। একদিনে অত দৌড় সহ্য করতে পারবে না!

নীলিমা বলিল,—খুব পারব। বাজি—

—বাজি! বলিয়া বিনয় একটু থামিল, পরে গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—বেশ, বাজি বাজিই। গুণে আমায় পঞ্চাশখানি লুচি ভেজে খাওয়াবে, আর গরমা-গরম কাটলেট।

নীলিমা হাসিয়া বলিল,—এই! আচ্ছা।

৩

সেদিন বেড়াইতে গিয়া পথে একটা চমৎকার বাগান চোখে পড়িল। কলিকাতার চাটার্জ্জি কোম্পানির নার্শারি। নানান্ রঙের ফুলের বাহার, পাতার বাহার গাছ সব খোলা ফটকের মধ্য দিয়া চোখে পড়িতেছিল। ওধারে লতায় পাতায় ঢাকা হট-হাউস। দুইজনেরই ইচ্ছা হইতেছিল, একবার ভিতরে গিয়া বেশ করিয়া বাগানখানা দেখিয়া আসে।

নীলিমা বলিল,—কেউ নেই? জিজ্ঞাসা কর না ভাই ঠাকুর-পো, বাগানটা দেখতে দেয় কি না।

বিনয় বলিল,—হ্যাঁ, দেখতে দেবে না আবার! এখানে ত এই সব গেঁয়ো লোক, আমরা কলকাতা থেকে এসেচি, বাগান দেখতে চাইছি শুনলে মাথায় করে দেখাবে'খন।

—তবে চল না।

—এসো। বলিয়া বিনয় আগাইয়া গিয়া বাগানে ঢুকিল। মুখে সে দম্ভ করিয়া ঢুকিল বটে, কিন্তু ফটকের মধ্যে পা দিতেই গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। যদি অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেয়! যদি পুলিশ ডাকে—!

আবার ভাবিল,—না, হাজার হোক্, বৌদি একজন মহিলা সঙ্গে আছে, মহিলা বাগান দেখিতে চলিয়াছে, মহিলার অপমান করিবে কি!

দুইজনে বাগানের মধ্যে খানিকটা আসিতেই এক মালীর সঙ্গে দেখা হইল। মালীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিনয় পরিচয় লইল, বাগানে কে থাকে।

মালী বলিল, চাটার্জ্জি বাবুদের এক আত্মীয় বাগান তদারক করেন। তিনিই ম্যানেজার। তা ম্যানেজার বাবু এখন কলিকাতায় গিয়াছেন। তাঁর বাড়ীর মেয়েরা বাগানের মধ্যে ঐ ছোট বাঙ্‌লাটায় থাকেন।

নীলিমা বলিল,—মেয়েরা আছেন ?

মালী বলিল,—আছেন।

নীলিমা বলিল,—গিয়ে আলাপ করব ?

বিনয় বলিল,—না। কি রকম লোক, কে জানে!

নীলিমা বলিল,—দোষ কি! খেয়ে ত আর ফেল্‌বে না।

বিনয় বৌদির পানে চাহিল,—মুখে কিছু বলিল না। ভাবিল, কাহার বাড়ী, কি রকম লোক, কে জানে! সেখানে কাহার বাড়ীর মধ্যে বৌদিকে সে পাঠাইয়া দিবে? না, তা হয় না।

যাইতেও হইল না। বিনয় যখন এমনি ভাবিতেছে, তখন ভিতর দিক হইতে বিনয়ের বয়সী একটী ছেলে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল,—আপনারা কি চান ?

মালী বলিল,—বাবুরা বাগান দেখতে এসেছেন।

ছেলেটি নীলিমার পানে একবার চাহিল, লজ্জায় নীলিমার মুখ অমনি রাঙা হইয়া উঠিল। শাড়ীখানা তার পার্শী মেয়েদের ধরণে পরা ছিল, চট্‌ করিয়া মুখে ঘোমটা টানিতে পারিল না। তারপর পাও খালি নয়, পায়ে ছিল দিল্লীর জরিদার নাগরা! এ বেশে ঘোমটা টানাও নেহাৎ অশোভন দেখায়। ঘোমটা দেওয়ায় অভ্যস্ত হাত ঘোমটা টানিবার জন্য অধীর উদ্যত হইয়া উঠিলেও সে ঘোমটা টানিতে পারিল না। লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া নেহাৎ অপ্রতিভভাবে অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

ছেলেটি বলিল,—আসুন না, বাগান দেখবেন।

তারপর বিনয় ও নীলিমাকে লইয়া সে বাগান দেখাইয়া দিল। বাগান দেখা হইলে বলিল,—আমাদের বাড়ীতে যাবেন? ওখানে আমার মা আছেন, দিদি আছেন—আমরা ঐখানেই থাকি।

বিনয় চোখের ইঙ্গিত করিল, নীলিমা তাহার অর্থ বুঝিল। সে বিনয়ের দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিল,—না, আজ থাক্। দেরী হয়ে গেছে বড্ড।

তারপর বিনয়ের সঙ্গে ছেলেটির আলাপ হইল। এখানে কোথায় থাকে, কলিকাতার কোথায় বাড়ী, বিনয় কি করে? ছেলেটি নিজের পরিচয় দিল—মাথার অসুখ করিয়াছিল বলিয়া ডাক্তারের কথায় লেখা-পড়া ছাড়িয়া দিয়াছে, এখানে এখন নার্শারির কাজ শিখিতেছে। প্রত্যহ কলিকাতায়, এলাহাবাদে ও দিল্লীতে প্রচুর ফুল চালান দেয়। ছেলেটি নাম বলিল, সুধীর। বিনয় ও নীলিমা চলিয়া যাইতে চাহিলে সুধীর চকিতে হট-হাউসে ঢুকিয়া নানা রকম অর্কিডের ফুল আনিয়া নীলিমার পানে চাহিল, কহিল—একে বলে পারিজাত। আপনি এই ফুলের খুব সুখ্যাতি করছিলেন না? এই নিন্।

লজ্জায় নীলিমা মুখ আর তুলিতে পারিল না। বাঙালীর ঘরের অন্দরে বন্দী বৌ,—কলিকাতার আকাশের সূর্য্য যাহার মুখ দেখিতে পায় না—এখানে একজন অপরিচিতের হাত হইতে সে ফুল লইবে? সে ভারী অপ্রতিভ হইল। সুধীরও একটু অপ্রতিভ হইল। সে বিনয়কে বলিল,—আপনি নিন্।

বেচারার আতিথ্যে বৌদির এই ব্যবহার তাহার চোখে

নেহাৎ যেন তাচ্ছিল্যের মত ঠেকিল। বিনয় একটু কুণ্ঠিতও হইল। সে বলিল,—নাওনা বৌদি, ফুল—উনি দিচ্ছেন।

নীলিমা সলজ্জভাবে তখন ফুলটি গ্রহণ করিল।

ফটক অবধি আসিয়া সুধীর তাহাদের আগাইয়া দিল। তারপর বিনয় ও নীলিমা গমনোদ্যত হইলে সুধীর বলিল, -একদিন যাবো আপনাদের বাড়ী। কোন্ কুটীরে আপনারা থাকেন, বললেন? কুঞ্জ-কুটীরে, না?

বিনয় বলিল,—হাঁ। বেশ ত, যাবেন। নেহাৎ এখানে একলাটি আছি আমরা। পেলে ভারী খুসী হব।

৪

পরদিন ভোরে উঠিয়া বেড়াইবার জন্য সজ্জিত বেশে নীলিমা বাহিরে আসিয়া বাঙলার বাগানে ফুল তুলিতেছিল, বিনয়ের এখনো সাজ হয় নাই—সে আসিলেই দুইজনে বেড়াইতে যায়। এমন সময় হঠাৎ ফটকে কাহার সাড়া পাওয়া গেল। ও কে আসে না? হাঁ। ও যে কালিকার সেই সুধীর।

সুধীর আসিয়া একেবারে নীলিমার সম্মুখে দাঁড়াইল—তাহার হাতে ছিল হাঁসের মত এক বিচিত্র ফুল। দেখিয়া নীলিমা লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া পড়িল—নড়িতে পারে না, অথচ মুখে কিছু বলিয়া অতিথির মর্য্যাদা রাখিবে, তাহাও পারে না। সে কেমন বিব্রত হইয়া পড়িল। বাঙলার দিকে চাহিল, বিনয়ের উপর রাগ হইল,—দেখ দেখি, এখনো সে এত দেরী করিতেছে! আসুক না বাপু!

সুধীর কিন্তু নীলিমার এ অপ্রতিভ ভাব লক্ষ্য করিল না। ফুলটি দেখাইয়া সে বলিল,—এই নিন্। এটিও পারিজাত ফুল। কেমন চমৎকার বাহার,—দেখেছেন!

নীলিমা কিন্তু ফুলটি লইতে গিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল, নিশ্চয় এ ছেলেটি মনে করিয়াছে, তাহারা ব্রাহ্ম—কিম্বা ব্রাহ্মদের মতই স্বাধীন মহিলা, তাই এমন অসঙ্কোচে নীলিমার সঙ্গে আলাপ করিতে আসিয়াছে। কিন্তু সে ত জানেনা—

ফুল লইয়া কিছু যে বলা দরকার, তাহা সেও বুঝিতেছিল, কিন্তু কি বলিবে? কেমন করিয়াই বা বলিবে? বুক গুর্ গুর্ করিতেছে,—গলায় স্বরও হইতে চায় না! এ যে ভারী বিপদে পড়িল সে!

এমন সময় ভগবান রক্ষা করিলেন। বিনয় হঠাৎ আসিয়া সুধীরকে অভ্যর্থনা করিল। সুধীর বিনয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,—বেড়াতে বেরুচ্ছেন না কি? চলুন না, পাহাড়ে চড়বেন।

বিনয় বলিল,—পাহাড়! এখানে আবার পাহাড় কোথায়? ঐ উঁচু-উঁচু ঢিপিগুলো?

সুধীর বলিল,—না, পাহাড় বৈ কি!

বিনয় বলিল,—চলুন, যাব। এসো বৌদি, পাহাড়ে চড়বে ত?

নীলিমার পা তখন এমন ভারী হইয়া উঠিল যে তাহার নড়িবার শক্তি একেবারে লোপ পাইল। বিনয় তাড়া দিল,—এসো। তারপরে ফুলটা দেখিয়া বলিল,—ও, এটা রয়েচে! আচ্ছা, দাও। আমি ফুলদানীতে রেখে আসি। বাঃ, চমৎকার ফুল ত! বলিয়া বিনয় ঘরের মধ্যে ফুলটা রাখিতে গেল। সুধীর তখন নীলিমার পানে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল,—কালকের ফুলের চেয়ে আরো

ভালো ফুল এটা। তাতে খালি রঙের বাহার। এর গন্ধ আছে। গন্ধটুকু ভারী চমৎকার।

নীলিমা এ কথার কোন জবাব দিতে পারিল না। জবাব দিবার চেষ্টায় মুখ তুলিতেই সুধীরের সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল—লজ্জায় চোখের পাতা অমনি কাঁপিয়া মুদিয়া পড়িল।

বিনয় আসিয়া বলিল,—ভারী সুন্দর ফুল কিন্তু। আপনাদের নার্শারিটি চমৎকার। দেখে আমারো ফুলের চাষ করবার ইচ্ছা হচ্ছে। একটু-আধটু শিখিয়ে দেবেন?

তিনজনে তখন বেড়াইতে চলিল। সুধীরের সান্নিধ্য পদে পদে কেমন বেড়া রচিয়া ধরিতেছিল। সুধীর ও বিনয় দুইজনে কত কথা কহিয়া চলিয়াছে—সে কথায় তাহাকে যোগ দিতে বলারও ইঙ্গিত ছিল প্রচুর, তবু কথা বাহির হইতেছিল না। অতি সংক্ষেপে একটা হাঁ কি না বলিয়াই সে যেন হাঁফ ফেলিতেছিল। বিনয়ের উপর রাগ হইতেছিল—দেখ দেখি তার আক্কেল! দুইজনে কেমন বেড়াইতে যাইতাম, কোথা হইতে ইহাকে আবার সাথী করিয়া সঙ্গে লইল!

৫

সুধীরের উপর এ কিন্তু-ভাব শীঘ্রই কাটিয়া গেল। এমন গায়ে-পড়া ছেলে সে যে তাহাকে এড়াইয়া যাইবার জো কি! বেড়ানোর সময় ও দুপুর বেলায় সে ত হাজির থাকিতই—তা ছাড়া দমকা হাওয়ার মত এমনি অতর্কিতে যখন-তখন বাড়ীতে আসিয়া উদয় হইত যে নীলিমা সর্ব্বক্ষণ কেমন তটস্থ থাকিত। এত আসা-যাওয়া করিলেও নিজের সলজ্জ কুণ্ঠিত ভাবটাকে সে

কাটাইতে পারে নাই। কখন্ নীলিমা হয়ত মোহন-ভোগ তৈরী করিতেছে—মাথায় কাপড় নাই, ভিজা চুলের রাশ পিঠ বহিয়া ঝরাইয়া দিয়াছে, এমন সময় বৌদি বলিয়া সুধার দুম্ করিয়া আসিয়া হাজির। আবার শুধুই কি হাজির হওয়া! সামনে বসিয়া এমনি রাজ্যের গল্প জুড়িয়া দিল যে, আর কিছুরই হুঁস রহিল না! নীলিমা যদি কাজের ছল করিয়া অন্য ঘরে উঠিয়া গেল, সেও অমনি পাছু পাছু চলিল। বিনয় যদি কোনদিন বাড়ীতে না থাকিল ত তাহাতে কিছুই ভাসিয়া যাইত না। সেদিন তাহার গল্পের উৎসাহ যেন আরো বাড়িয়া উঠিত। প্রতিদিন সকালে সে ফুল লইয়া আসিত,—কোনদিন গোলাপের প্রকাণ্ড তোড়া, কোনদিন বা নানা রঙের সিজন্ ফ্লাওয়ার, কোনদিন বা কোন মনোহর অর্কিডের ফুল। নীলিমা ফুল ভালবাসে। ফুল পাইয়া তাহার চিত্ত সুধীরের দিকে ক্রমেই একটু-একটু করিয়া আকৃষ্ট হইতেছিল। আবার শুধুই কি সে ফুল লইয়া আসিত? তার উৎপাতও ছিল বিলক্ষণ! একদিন দুই কাঁধে দুই কাঠ-বিড়ালী লইয়াই হাজির। নীলিমার গায়ে সেদিন একটা কাঠ-বিড়ালীই ছাড়িয়া দিল। নীলিমা ভারী রাগ করিয়াছিল—[illegible] ছোক্, অত বড় ছেলে, কি বলিয়া একজন অপর-নারীর সঙ্গে এমন রঙ্গ করিতে সে সাহস পায়! নীলিমার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া সুধীরও বুঝিয়াছিল, কাজটা অন্যায় হইয়াছে। তাহার চোখ অমনি অনুতাপের ক্ষুব্ধ বেদনায় ছলছলিয়া আসিয়াছিল। কি একটা আছিলা তুলিয়া নীলিমা অন্যত্র চলিয়া গেল—আর সুধীর কেমন হতভম্বের মত মৌন বসিয়া রহিল। তাহার সে বিষণ্ণ মুখ আর অনুতপ্ত ম্লান ভাব নীলিমার প্রাণেও

কাঁটার ব্যথার মতই বাজিয়াছিল। তাই সে-ই আবার ফল ছাড়াইয়া হাতের তৈয়ারী জেলি খাইতে দিয়া সুধীরের মনের সে-ভাব মুছিয়া দেয়!

সেদিন বিনয় হঠাৎ মহা-উৎসাহের সুরে বলিয়া উঠিল—বৌদি, জাননা ত, কি গ্র্যাণ্ড ডিস্‌কাভারি আমি করেচি! সুধীর বাবু কবি। তাঁর এই খাতাখানি আমি চুরি করেচি। পড়বে?

সুধীর নিতান্ত অপরাধীর মত হাত বাড়াইয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—না, না, ছি, ও সব ছেলেমাস্কী আর বৌদিকে দেখাবেন না। সত্যি ! লজ্জায় সে যেন এতটুকু হইয়া গেল।

নীলিমা বলিল,—না, না, দিয়ো না ভাই ঠাকুরপো। ছেলেমানুষে ছেলেমাস্কী করেছ, তা দেখতে দোষ কি, শুনি? বিশেষ তুমি আমায় বৌদি বলে ডাকো যখন, আমি ত বৌদি হলুম—

নীলিমা বাংলা বইয়ের পোকা। গল্প উপন্যাসের চেয়ে কবিতাই সে বেশী পড়িতে ভালবাসে। নিজেও দুই-একবার কবিতা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিল—সে বহুদিনের কথা। কিন্তু সে কাব্য-রচনায় বিনয়ের উৎসাহ আর উল্লাস এমনি ভাবণ চীৎকারে ফুটিয়া বাহির হইত যে ঠাট্টার ভয়ে কবিতার চর্চ্চা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল।

বিনয়ের হাত হইতে তাড়াতাড়ি খাতাখানা লইয়া নীলিমা বলিল—তুমি লেখো পদ্য? এ খাতার সবগুলো তোমার লেখা?

কথাটা বলিয়া সুধীরের পানে চাহিতেই সে দেখিল, কি করুণ অসহায়তা সুধীরের দুই চোখের দৃষ্টিতে মাখানো! যেন অতিগোপন প্রাণের কথাটুকুকে তার পবিত্র আবরণ ভাঙ্গিয়া লোক-চক্ষে কে

ধরিয়া দিয়াছে, আর সেখানকার তাচ্ছল্য-অপমানের ভয়ে বেচারা সারা হইয়া উঠিয়াছে! তেমনি দুম্‌ড়ানো মূর্ত্তি! দেখিয়া নীলিমার মন গলিয়া গেল।—সে বলিল,—আমি দেখতে পারি কি ভাই?

এই সস্নেহ মিষ্ট প্রশ্নে সুধীরের সমস্ত লজ্জার উপর যেন কার প্রসাদ হস্তের পরশ লাগিল। আনন্দ-দীপ্ত নেত্রে সে বলিল—আপনি পড়বেন? বেশ ত, পড়ুন। কিন্তু ঠাট্টা করবেন না।

বিনয় বলিল,—ওহে, ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়। কবি হতে গেলে এ-তিনটে ত ছাড়তেই হয়, তাছাড়া পৃষ্ঠ-চর্ম্ম আর চক্ষু-চর্ম্মও আজ-কাল রীতিমত কড়া করা দরকার। যে রকম সমালোচকের দৌরাত্ম্য!

নীলিমা বলিল—ভয় নেই ভাই, আমি এ খাতা লুকিয়ে পড়ব, আর কাকেও দেখাব না।

বিনয় বলিল,—বা, কি স্বার্থপর! যে ডিস্‌কাভার করলে, কলম্বস্—সে-ই দেখ্‌তে পাবে না?

নীলিমা হাসিয়া বলিল,—না, কাঠখোট্টা লোকদের কবিতা পড়বার অধিকার নেই!

—আচ্ছা, দেখা যাবে। বলিয়া বিনয় জলখাবারে মনঃসংযোগ করিল।

নীলিমার মন অধীর হইয়া উঠিল। আঁচলের তলায় পাখীর মতই খাতাখানা যেন ঘুমাইয়া পড়িয়া আছে! বিনয় সুধীর খাইতে বসিয়াছিল,—কখন খাওয়া শেষ হয়! অমনি আঁচলের ঢাকা খুলিয়া এই অচিন পাখীটিকে সে বাহির করিবে! পাখী তখন কি বিচিত্র সুরেই না জানি গান সুরু করিয়া দিবে!

একটু ফাঁক পাইতেই সে খাতা খুলিল। কবিতা পড়িয়া অবাক হইয়া গেল। লেখা বেশ—ভারী মিঠে ভাব! প্রথম কবিতা,—ফুলের রাণী। সুধীর লিখিয়াছে,—ফুলগুলা আর কিছুই নয়, তরুণীর রূপের বিচিত্র বিকাশ শুধু। তার মুখের হাসি, নয়নের দিঠি, যৌবনের হিল্লোল, অধরের গোলাপী রঙ—ইহারা মিলিয়াই ফুল হইয়া ফুটিয়াছে। কেহ দিয়াছে কোমল দল, কেহ দিয়াছে রূপ, শোভা, আবার কেহ বা দিয়াছে ছন্দ! বেশ লিখিয়াছে, বাঃ! তার পর আরো কতকগুলা কবিতা পড়িয়া নীলিমা বুঝিল, এ কবিতার উৎস একজন কেহ নিশ্চয়ই আছে! কবিতাগুলি আগাগোড়াই যেন এক রূপসী তরুণীকে কেন্দ্র করিয়া নানা সুরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে! নীলিমা ভাবিল, নিশ্চয় সুধীরের বিবাহ হইয়াছে, নহিলে এ-সব ভাব সে কোথা হইতে পাইবে!

৩

পরদিন বেড়াইতে গিয়া বিনয় মাতিয়া উঠিল, এক বুনো খরগোস লইয়া। খোলা মাঠে একটা খরগোস দেখিয়া তাহার পিছনে এমনি তাড়া করিয়া সে ছুট্ দিল যে কাহারো নিষেধ গ্রাহ্য করিল না। বিনয় যখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে ফিরাইতে না পারিয়া সুধীর আসিয়া তখন নীলিমার কাছে বসিল। নীলিমা একটা পাথরের উপর বসিয়া সুধীরের খাতা পড়িতেছিল। খাতাটা সে সঙ্গে আনিয়াছিল। অস্তগামী সূর্য্যের রক্ত-রোগে এই তরুণীর মুখে কি অপূর্ব্ব শ্রীই যে ফুটিয়াছিল—! দেখিয়া সুধীর একেবারে উদ্ভ্রান্ত বিভোর হইয়া উঠিল। অপূর্ব্ব রূপ!

সুধীরের মনে হইল, এই রূপ হইতে যেন এক সুমধুর পুষ্পসুরভি উঠিয়া মাথার উপরকার নীল আকাশকে অবধি নেশায় বুঁদ করিয়া দিয়াছে!

সুধীর ডাকিল,—বৌদি—

নীলিমা খাতাখানা বন্ধ করিয়া বলিল,—তোমার লেখা বেশ ত! আমার ভারী ভাল লাগচে।

সুধীর কোন জবাব দিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, তাহার কবিতা লেখা সার্থক হইয়াছে! সে চুপ করিয়া রহিল। নীলিমা বলিল,—একটা কথা ঠিক বলবে ভাই?

সুধীর বলিল—কি?

—তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, না?

একটা ঢোঁক গিলিয়া সুধীর বলিল,—না। তারপর একটু হাসিয়া বলিল,—কেন ও কথা বলচেন, বলুন ত?

নীলিমা হাসিয়া বলিল,—তোমার পদ্য পড়ে মনে হচ্ছিল। বিয়ে হয়নি? সত্যি?

—না। আমি কি মিছে কথা বল্‌ছি?

—তা যদি না হয়ে থাকে ত লভ্ হয়েছে নিশ্চয়! না? ঠিক কথা বল দিকি ভাই—

সুধীর কোন কথা না বলিয়া মাথা নামাইল।

সুধীরকে অপ্রতিভ ও নিরুত্তর দেখিয়া নীলিমা আবার বলিল—কেমন, ঠিক ধরেচি কি না! আজকালকার ছেলে ত—ঐ যে মুখ নীচু কর্‌লে! বাঃ! বলেচি, না হলে এ-সব কবিতা কি ছেলেমানুষে লিখতে পারে কখনো!

তখন নীলিমার মুগ্ধ চিত্তের সাম্‌নে তাহার নিজের জীবনেরই

অতীতের একটা পৃষ্ঠা জল্‌-জল করিয়া ফুটিয়া উঠিল। একটু সত্যকার কিছু না থাকিলে কি প্রাণে ভাব আসে! সেই যে স্বামীর প্রণয় নিবিড়ভাবে যখন সে লাভ করিয়াছিল, স্বপ্নের মধ্য দিয়াই যখন তাহার দিন-রাত্রিগুলা কাটিত, তখন কি বিচিত্র সুরেই না তাহার মনও পূর্ণ থাকিত! চাঁদের আলো, দখিণ হাওয়া, ফুলের গন্ধ, এ সমস্তই যেন স্বামীর সোহাগের বিচিত্র পরশ লইয়া ধরা দিত! সেই কথাটা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন ক্রমে বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। হায় রে, এই ত সবে তাহার উনিশ বৎসর মাত্র বয়স। এই বয়সেই স্বামীর সে প্রণয়ের উচ্ছ্বাস চলিয়া গিয়াছে! প্রেম বলিয়া জিনিষটারো সে আর কৈ দেখাও তো পায় না! এখন শুধু সংসার আর কাজ! হায়রে অদৃষ্ট!

হঠাৎ সুধীর একটা নিশ্বাস ফেলিল। নীলিমার স্বপ্ন অমনি সে নিশ্বাসে ভাঙ্গিয়া গেল। সে বলিল,—কাউকে ভাল বেসেচ, না? বল না। তোমাদের বাড়ীতে বলবো না। বল—

সুধীর ডাকিল—বৌদি—

কথাটা আর বলা হইল না। ওদিকে বিনয় হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া মাটীর উপর বসিয়া পড়িল। বলিল—কি, তোমাদের কাব্য-চর্চ্চা হচ্ছে না কি! বেড়ে জুটেচ দু'জনে! বলিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতেই বলিল,—এমন ছুট্ করিয়েছে খরগোসটা! আঃ—

নীলিমা বলিল,—খরগোসের সঙ্গে বাজি রেখে কথামালার কচ্ছপও জিতেছিল, আর তুমি সে কূর্ম্ম অবতারেরও পরে দাঁড়ালে, তাহলে,—এঁ্যা?

বিনয় বলিল,—কি ?

নীলিমা তাড়াতাড়ি বলিল,—ও ওর কবিতার কথা হচ্ছে। তারপর বিনয়কে কহিল,—শীকার হলো না তাহলে ?

—না। বলিয়া বিনয় একটা বিশ্রী মুখভঙ্গী করিয়া মাটীতেই শুইয়া পড়িল এবং তিনজনেই চুপচাপ রহিল। বিনয় ভাবিতেছিল, কলিকাতার বাহিরেই জীবনটাকে যা-কিছু উপভোগ করা যায়! স্বাধীনতার মুক্ত হিল্লোল,—কোথাও এতটুকু বাধা নাই, বন্ধ নাই! এই যে খরগোসটার পিছনে সে ছুটিয়াছিল, নেহাৎ শিশুর মতই—এটা কি কলিকাতায় করিতে পারিত! ওদিকে সুধীরের প্রাণে বাজিতেছিল, বিচিত্র ঝঙ্কারে কত সে সুর! রূপ, রূপ, দুনিয়া রূপের নেশায় পাগল হইয়া আছে রে! এই রূপই মানুষকে যা একটু শান্তি দিতে পারে। এত বড় পৃথিবীটা রূপ না থাকিলে রৌদ্রতপ্ত শুষ্ক মাঠের মতই খাঁ-খাঁ করিত! নীলিমা সুধীরের খাতা খুলিয়া কবিতা পড়িতে লাগিল। সুধীর এক জায়গায় লিখিয়াছে, —আকাশ ঘনঘোর মেঘে ভরা। তরুণী প্রিয়া আজ ঘন-কৃষ্ণ চিক্কণ কেশের রাশি ঝরাইয়া দিয়াছে। কালো কাদম্বিনী আকাশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। প্রিয়া কি অভিমানে বসিয়াছে? ঐ মেঘ ডাকিল—ও কি প্রিয়ার অশ্রুরুদ্ধ চাপা কণ্ঠস্বর! ঐ চপলার চমক —ও কি প্রিয়ার হাসি গো! এমনি অনর্গল সে লিখিয়া গিয়াছে। কোনটা ভাবের সহিত খাপ খাইয়াছে, আবার কোথাও বা নেহাৎ অর্থহীন কতকগুলা শব্দ উদাসীর প্রলাপের মতই গাঁথিয়া গিয়াছে! শেষে প্রিয়াকে এক জায়গায় সে নীল, নভ-নীলবরণী বলিয়া আহবান করিয়াও ফেলিয়াছে। সেটুকু পড়িয়া নীলিমা কেমন চমকাইয়া উঠিল। সন্দিগ্ধভাবে একবার সুধীরের পানে

চাহিল। সুধীর তখন চোখে কেমন সে এক দৃষ্টি লইয়া তাহারি পানে চাহিয়া আছে! সে দৃষ্টি কাঁটার মত নীলিমাকে বিঁধিল। নীলিমা অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

৭

পরদিন সকালে বেড়াইয়া আসিয়া নীলিমা বিজয়ের পত্র পাইল। বিজয় লিখিয়াছে, বড়দি আসিয়াছে। তার মেয়ের অসুখ, ডাক্তার দেখাইবার জন্য। এ সময় সে ও বিনয় বাড়ী আসিলে ভাল হয়।

অমনি স্বামীর নিঃসঙ্গতার কথা নীলিমার মনে পড়িল। আহা, একা সারাদিন খাটিয়া-খুটিয়া ঘরে আসিয়া বসিলে কেই বা তাহার সাম্‌নে সেখানে জলখাবারটুকু গুছাইয়া ধরিয়া দেয়! কেই বা অফিসে যাইবার সময় পানের ডিপাটি হাতের কাছে আগাইয়া দেয়, পোষাক-পরিচ্ছদ ঠিক ঝাড়া হইল কি না দেখে! ঘাড়ের কাছে হয়ত একরাশ ধূলা জমিয়া আছে, সেই ধুলা না ঝাড়িয়া ঘাড়ে লইয়াই অফিসে চলিয়া যায়—রুমালখানা ময়লা হইয়া গিয়াছে, ঠিক সময়ে সেটা বদলাইয়া দেওয়া হয় না। সে ত বিজয়কে জানে,—কি-রকম তার এলোমেলো ঢিলা স্বভাব—কোনদিকে দৃষ্টি নাই, শুধু টাকার পিছনে উন্মাদের মতই ছুটিয়া চলিয়াছে!

বিনয়কে ডাকিয়া সেই রাত্রেই সে কলিকাতায় ফিরিবার ঠিক করিল। সন্ধ্যার পর ট্রেণ। ভোরে গিয়া পৌঁছিবে। বড় ঠাকুরঝি আসিয়াছে, মেয়ে অমলার অসুখ। কি অসুখ, কে জানে!

সুধীর আসিয়া সে দিন দুপুরবেলাতেও নিত্যকার মত অতিথি হইল। নীলিমা তখন জিনিষ-পত্র গুছাইতে ব্যস্ত।

সুধীর বলিল,—আজ আপনারা সত্যিই তাহলে চল্‌লেন, বৌদি ?

সংক্ষেপে—হঁা ভাই বলিয়া সে আবার রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। গিয়া ঠাকুরকে বলিল,—ওবেলার জন্যে লুচিগুলো ভেজে তরকারী শুদ্ধ কতক বাইরে রাখবে, আর টিফিন-বাক্সে কিছু ভরে দেবে ঠাকুরপোর জন্যে। ট্রেণে সে খাবে, যদি খিদে পায়।

সুধীর একটু ক্ষুণ্ন হইল। কাল যে কথাটা শুনিবার জন্য নীলিমা অতখানি আগ্রহ দেখাইল, সে কথা তাহার আজ মনেও নাই! তাহার কবিতার সেই উৎসের কথা! সে যে অনেক ভাবিয়া একটা হেঁয়ালি-ভরা জবাবও ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল! যাক্! সে বিনয়ের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল। তাহার প্রফুল্ল মনে বিষাদের মেঘ দেখা দিয়াছিল। কেমন হাসি-গল্পে দিন কাটিতেছিল, জীবনে একটা পুলকের চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল, সে-সব শেষ হইয়া গেল! কাল হইতে দিনের আলো নিবিয়া যাইবে, আবার সেই একান্ত. নির্জীব অতীতের দিনই ফিরিয়া আসিবে। মালীদের পিছনে ঘুরিয়া কাজের তদ্বির করা, নিত্য সেই ফুল চালান্ দেওয়ার হাঙ্গামা—নিতান্তই একঘেয়ে, নীরস কাজ!

সন্ধ্যার পর নীলিমা ও বিনয় ট্রেণে গিয়া চড়িয়াছে, অমনি সুধীরও কোথা হইতে ঝুড়ি-ভরা ফুলের রাশ আনিয়া ট্রেণের কামরায় নীলিমার কোলের উপর তাহা ঢালিয়া দিল। গন্ধে বর্ণে ট্রেণের কামরায় যেন নন্দনের শোভা ফুটিল। ব্যস্ত হইয়া ফুলগুলা কোল হইতে সরাইতে গিয়া একটা গোলাপের কাঁটা

নীলিমার হাতে ফুটিল। উঃ—বলিয়া হাসিয়া নীলিমা হাত তুলিল।

সুধীর বলিল—কাঁটা ফুটল বুঝি! ঐ ত দোষ, এমন সুন্দর ফুল! কাঁটার ঘা বাদ যায় না। এই দেখুন বৌদি, নিজের হাতে ফুল তুলেচি কিনা, কাঁটায় বিঁধে আঙুলগুলোর কি দশা হয়েচে, দেখুন।

সুধীর হাত দেখাইল। নীলিমা দেখিল, আঙুলের আগাগুলা তাহার ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে।—আহা—বলিয়া নীলিমা তাহার পানে চাহিল, এমন সময় ট্রেণের ঘণ্টা পড়িল। নীলিমা বলিল,—কালকের কথা মনে আছে ত? কলকাতায় গেলে আমাদের ওখানে যেয়ো। বাড়ীর নম্বর মনে আছে?

—আছে। বলিয়া সুধীর স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বিনয় জিনিষ-পত্র গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। কতক বাঙ্কের উপর ঠাসিয়া দিল, কতক বেঞ্চের নীচে গুঁজিল।

নীলিমা বলিল,—বাসনের থলেটা চাকরদের কামরায় দিলে, না, গার্ডের ব্রেকে?

—সে সব ব্রেকে দিয়েচি।

তারপর সুধীরের হাত ধরিয়া সজোরে শেকহ্যাণ্ড্ করিয়া বিনয় বলিল,—তাহলে নিশ্চয় যাবেন। মনে থাকে যেন, কথা দিয়েছেন।

—নিশ্চয় যাব—বলিয়া সুধীর একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

আলো-আঁধারের মধ্য দিয়া ট্রেণ চলিতে সুরু করিল—ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম্ম ছাড়াইল। নীলিমা জানালা দিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল, ঐ মাটীর পুতুলের মত সুধীর দাঁড়াইয়া আছে! ওদিকে

সুধীরের চোখের সামনে হইতে সব আলো নিবিয়া গেল। ট্রেণ যেন তাহারই বুকের হাড়-পাঁজরাগুলাকে মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া চলিয়া গেল।

৮

তারপর তিন-চার মাস কাটিয়া গেছে। সুধীরের কথা, মিহিজামের কথা নীলিমার মনে অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র গন্ধের একরাশ ফুল লইয়া বিনয় আসিয়া নীলিমাকে ডাকিল—বৌদি—

নীলিমা তখন ঠাকুর-ঘরে ঠাকুরের বৈকালি সাজাইতেছিল। চোখ না তুলিয়াই সে বলিল,—কি ভাই ঠাকুরপো?

বিনয় বলিল,—এই দেখ, কি এনেচি।

নীলিমা ফিরিয়া হাসিয়া বলিল,—কি, ফুল? মিউনিসিপাল মার্কেটে গেছলে বুঝি? কেন এত পয়সা খরচ করে বাবুগিরি করা বল দিকি? এত ফুল নিয়ে কি করব আমি? এ ফুলে ঠাকুরপুজোও হবে না কিছু।

বিনয় হতাশার অভিনয় করিয়া বলিল,—এইজন্যেই বলে, নারী চির-অকৃতজ্ঞ। কিনে আন্‌বো কেন? এ ফুল দেখেও চিন্‌তে পারছ না? এ যে সেই মিহিজামের নার্শরির ফুল।

মিহিজামের ফুল! নীলিমা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

—হাঁ। সুধীর বাবু এসেচেন এ ফুল নিয়ে। প্রায় দেড় ঘণ্টা আমার সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে তিনি কথা কইচেন, এইবার চলে যাবেন।

—জলখাবার দিয়েচ?

—না।

—দাও গে।

—তুমি দেখা করবে না, একবার তার সঙ্গে ?

—পাগল। বলিয়া নীলিমা কেমন অস্বচ্ছন্দভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।—আমি দেখা করব কি! বৌ-মানুষ—

বিনয় জ্বলিয়া গেল। সে বলিল,—বৌ-মানুষ, তা কি হয়েচে ? মিহিজামে তাকে নিয়ে একসঙ্গে বেড়ানো, বসা-দাঁড়ানো, গল্প করা—হাজার হোক্, একটা আলাপ-পরিচয় আছে ত। আর এখানে একেবারে পর্দ্দার বিবি বনলে! কেন, কথা কইতে দোষ কি, শুনি ?

লজ্জিত কুণ্ঠিতভাবে নীলিমা বলিল,—সে হল বিদেশ, তাই পথে-ঘাটে বেড়িয়ে বেড়াতুম। এখানে বৌ-মানুষ—কোন সম্পর্ক নেই, তার সঙ্গে অমনি দেখা করব? তা হয় না ভাই। লোকে বলবে কি ?

বিনয় রাগিয়া ফিরিবার উপক্রম করিল। ফুলগুলা তুলিয়া লইয়াই সে যাইতে উদ্যত হইল।

নীলিমা বলিল,—জলখাবার আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, চা তৈরী করেও পাঠাচ্ছি। তাকে বসাও গে একটু।

বেশ একটু ঝাঁঝালো সুরেই বিনয় বলিল,—থাক্, আর দরদে কাজ নেই। একটু সন্দেশ কি এক পেয়ালা চায়ের কাঙাল হয়ে তোমার দোরে সে আসে নি ত। বলিয়া বিনয় ফুলগুলা লইয়া চলিয়া গেল।

নীলিমা অপ্রতিভ স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া বারান্দায় চিকের পিছনে দাঁড়াইল। সেখান

হইতে বিনয়ের ঘর দেখা যায়। ঐ যে বিনয় আর সুধীর। সুধীর উঠিয়া যাইতেছে।

পনেরো মিনিট পরে বিজয় আসিয়া ডাকিল,—নীলি—

নীলিমা বলিল,—কি ?

বিজয় কহিল,—ছেলেটির সঙ্গে দেখা কর্‌লে না যে!

নীলিমা কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার চোখের সাম্‌নে জাগিয়া উঠিল, সুধীরের সেই উদাস দৃষ্টি,—কেমন ব্যাথের ক্ষুধা যেন তাহাতে জড়ানো থাকিত! আর সেই কবিতা,—সুধীর কাহাকে ভালবাসিয়া সেই সব কবিতা লিখিয়াছে! সেই নীল, নভ-নীলবরণী! ক্ষুদ্র একটা সন্দেহ সেইদিন হইতেই নীলিমার বুকে বিঁধিয়াছিল। তারপর সেই কথা,—ফুলের সঙ্গে কাঁটা থাকে! এ-সব কি কথা? এ কথার মানে?

বিজয় হাসিয়া বলিল,—ওর সঙ্গে কথা কইছিলুম। ছেলেটি ভালো। তুমি ফুল ভালবাস বলে কোথা থেকে তোমার জন্যে এই ফুলের রাশ বয়ে এনেচে, দেখ দিকি! একটু মাথা-পাগলা আর কি! তোমার রূপ দেখে লভে পড়েচে—নয় কি? বলিয়া সে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল!

এ সন্দেহ যে নীলিমার মনেও কাঁটার মতই খচ্‌খচ্‌ করিতেছিল! আশ্চর্য্য! সে সুধীরকে নিজের ভাইটির মতই মনে করিত যে—বিনয়কে যে-চোখে দেখে, ঠিক সেই চোখেই দেখিত! আর সে কি না? কি লজ্জা! আর আজ স্বামীও ঐ কথা বলিতেছে? কথাটা কাঁটার মত তাহার বুকে বিঁধিল। সে অশ্রু-রুদ্ধ স্বরে বলিল,—ছি, ও কি বল্‌চ! ও রকম ঠাট্টা করে কখনো!

বিজয় সস্নেহে নীলিমাকে তুলিয়া বুকের কাছে টানিয়া হাসিয়া বলিল,—তুমি পাগল হলে! এই কথায় কাঁদ্‌চ!…কিন্তু একবার দেখা করলে না কেন? আহা, বেচারা! ও যদি তোমায় দেখে খুসীই হয়—!

নীলিমার দুই চোখে জল ঝরিয়া পড়িল। বিজয় হাসিয়া বলিল,—আমি ত জানি, তোমার ও মনের দোর কি রকম শক্ত আগড়ে বাঁধা, সেখানে মহা-পরাক্রান্ত রাজপুত্রেরও প্রবেশাধিকার নেই!

কাঁদিয়া নীলিমা বলিল,—না, না, ও কথা তুমি অমন করে বলো না গো। নীলিমা বিজয়ের বুকে মুখ গুঁজিল। সে ফোঁপাইতে লাগিল।

বিজয় নীলিমার পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিল,—কথা কওয়ায় কোন দোষ ছিল না, নীলি। এটা নিষ্ঠুরতা হলো না কি? বেচারী মুখখানি চূণ করে চলে গেল।

একটা ঝঙ্কার দিয়া নীলিমা বলিল—যাক্‌গে।

নীলিমার সেই তাচ্ছিল্যের ফুৎকারে বিশ্বের আলো ক্ষণেকের জন্ত ম্লান হইয়া গেল না কি?—কে জানে!

—

কিঙ্করী

কিঙ্করী সাধন বৈষ্ণবের মেয়ে। তাহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন বাপের মৃত্যু হয়। ধানগাঁয়ে বাপের একখানি ছোট দোকান ছিল; বাপ সাধনের মৃত্যুর পর কিঙ্করীর মা রাধা বৈষ্ণবী স্বামীর দোকান খুলিতে না খুলিতে পাওনাদারের দল আদালতের পেয়াদা-সমেত আসিয়া সব জিনিষ-পত্র বাহির করিয়া দোকান-ঘর সাফ করিয়া ফেলিল। পাঁচ বৎসরের মেয়ে কিঙ্করীকে লইয়া রাধা বৈষ্ণবী দারুণ দুর্ভাবনায় পড়িল।

কি করিবে কিছুই যখন সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না, তখন ও-পাড়ার বড় গোঁসাই আসিয়া বলিলেন,—দিগম্বরের মেয়ে-যাত্রার দলে মেয়েটিকে দে, সখী সাজিয়া এইবেলা হইতেই কিছু-কিছু সে রোজগার করুক! ইচ্ছা করিলে গোঁসাইয়ের গৃহে বাসন কোসন মাজিয়া রাধা দুইবেলা দুইমুঠা ভাত অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারে, সে বিষয়ে গোঁসাইজীর কোন আপত্তি নাই, কারণ তিনি বাঁচিয়া থাকিতে দেশের মেয়ে না খাইয়া মরিবে, ইহা তিনি চোখে দেখিতে পারিবেন না। এ কথাটাও সেই সঙ্গে তিনি বলিয়া ফেলিলেন।

রাধা অকূলে কূল পাইল। মেয়েটি ছিল দেখিতে সুশ্রী। দিগম্বর একেবারে তাহাকে মাসিক পাঁচ-সিকা মাহিনায় যাত্রার দলে ভর্ত্তি করিয়া লইল।

পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া মেয়ে রাখাল-বালক সাজিয়া নাচিতে নাচিতে আধ-আধ ভাষায় কখনো গাহিত,

আয় রে কানাই, আয় গোঠে যাই,
বাজায়ে মোহন বেণু—

কখনো-বা মাথায় রঙিন ন্যাকড়ার তৈয়ারী. ফুলের মুকুট পরিয়া বিশাখা সাজিয়া গাহিত,

ও রাই ছেড়োনা, ছেড়োনা এ মান—

তখন সে গান শুনিয়া আনন্দে-গর্ব্বে মার চোখে জল আসিত।

এমনি করিয়া পাঁচ-সাত বৎসর বেশ কাটিয়া গেল। তারপর নানা দিক দিয়া বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিল। কিঙ্করী এখন পাঁচ-সিকার জায়গায় সাত টাকা মাহিনা ও বিদেশে গেলে অতিরিক্ত আরও-কিছু পায়, এবং সখীর দল ছাড়িয়া সে এখন নায়িকার গ্রেডে প্রোমোশন পাইয়াছে। বছর-খানেক পূর্ব্বে মেয়েকে মানভঞ্জনের পালায় শ্রীরাধা সাজিতে দেখিয়া রাধা প্রসন্ন চিত্তে ইহলোকের দেনা-পাওনা চুকাইয়া চলিয়া গিয়াছে। দিগম্বরের দলে কেনারাম এখন মালিক। কেনারাম পূর্ব্বে দিগম্বরের দলে পালা বাঁধিত, সেজন্য দলে তাহার খাতির ছিল খুবই। সুতরাং দিগম্বরের মৃত্যুর পর ছত্র-ভঙ্গ দলটাকে হাত করিয়া বাঁধিয়া লইতে তাহার একটুও অসুবিধা হইল না।

কেনারাম গুণের কদর বুঝিত। কিঙ্করী গাহিত ভাল, তার উপর চেহারায় চটক্ আছে দেখিয়া সে পাঁচ সিকার জায়গায় কিঙ্করীর একেবারে সাত টাকা মাহিনা করিয়া দিয়াছে।

এই গুণের উপর আরো-একটা কারণ ছিল। কেনারামের তিন কুলে আপনার বলিতে কেহ ছিল না। সংসারে শুধু

একটিমাত্র আকর্ষণ ছিল, সে এই গান-বাজনার নেশা। এই গান-বাজনার নেশাই তাহাকে দেশে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল; নহিলে সে যে এতদিন কোথায় থাকিত, কি করিত, কেহ তাহা বলিতে পারে না। ছেলেবেলায় গ্রামে স্কুলে যাইবার পথে সে এক হাফ্-আখড়াইয়ের দলে জুটিয়া পড়ে, সেখানে তামাক সাজিয়া ফরমাস খাটিয়া সে সকলের মন পাইয়াছিল; তারপর হঠাৎ একমাত্র অভিভাবক মাতুলের মৃত্যুর পর লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া সে দস্তুরমত আসরে নামিয়া পড়িল। কবির দলেই তাহার পালা বাঁধার হাতে খড়ি হয়, এবং সহসা একদিন রাবণ-বধের পালা লইয়া দিগম্বরের দলে আসিয়া সে যোগ দিল।

দলে আসিয়া কিঙ্করীর উপর প্রথমেই তাহার নজর পড়িল। চমৎকার মেয়েটি ত! দেখিতে যেমন সুশ্রী, নাচিতে-গাহিতেও তেমনি মজবুত! এই কিঙ্করীকে একটু-আধটু লেখাপড়া শিখাইতে পারিলে যাত্রার পশার যেমন বাড়িবে, তাহার পালাগুলাও তেমনি উতরাইয়া যাইবে। অমনি সে কাজে সে ঝোঁক দিয়া লাগিয়া পড়িল। কিঙ্করীরও এদিকে একটা আশ্চর্য্য টান ছিল—অত্যন্ত সহজেই সে এই সুযোগটুকুকে আয়ত্ত এবং সফল করিয়া তুলিল। কিঙ্করীর চেহারায়, হাবভাবের লীলায় আর অভিনয়-কৌশলে দেশময় যাত্রার দলের সুখ্যাতি রটিয়া গেল।

মাঝের পাড়ায় জমিদার-বাড়ীতে যাত্রা করিতে গিয়া কিঙ্করী দৈবাৎ কলিকাতার এক থিয়েটার-ওয়ালার নজরে পড়িল। একে থিয়েটারওয়ালা, তায় কলিকাতার লোক, সে বুঝিল, কিঙ্করীকে কলিকাতার থিয়েটারে লইয়া যাইতে পারিলে শস্তায় অনেকখানি লাভের সম্ভাবনা! গোপনে কিঙ্করীর

সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া এ বিষয়ে বন্দোবস্তও সে একরকম পাকা করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু যাইবার দিন কেনারামকে না বলিয়া চলিয়া যাইতে কিঙ্করীর কিছুতেই মন সরিল না।

ব্যাপার বুঝিয়া কেনারাম চিন্তিত হইল, স্থির দৃষ্টিতে কিঙ্করীর মুখের পানে চাহিল। চাহিতেই আর একটা জিনিষ কেনারামের চোখে পড়িল। কিঙ্করীর সারা অবয়বে এমন অপরূপ তারুণ্যের ছটা দেখা দিয়াছিল! আজ কিঙ্করীকে সে দেখিল, সম্পূর্ণ নূতন চোখে, নূতন মূর্ত্তিতে! দেখিয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। কিঙ্করীও কোন কথা বলিতে পারিল না, শুধু মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিজের পালার যশের কথাও সেই সঙ্গে কেনারামের মনে পড়িল। কেনারাম তখন পাকা চাল চালিল। সে কিঙ্করীকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। থিয়েটার-ওয়ালাকে অগত্যা অত্যন্ত নিরাশ চিত্তে কলিকাতায় ফিরিতে হইল!

কিঙ্করীর বয়স তখন পনেরো বৎসর। সুমধুর লাবণ্য কিঙ্করীর দেহে তখন অপূর্ব্ব তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয়া খেলা সুরু করিয়াছে!

২

তারপর হঠাৎ একদিন যাত্রার দুর্দ্দিন আসিল। কলিকাতার স্কুল-কলেজ-ফেরত ছোকরার দল পাড়ায়-পাড়ায় সখের থিয়েটার খুলিয়া যাত্রার সর্ব্বনাশ সাধিল। ছেঁড়া ন্যাকড়ায় রঙ মাখাইয়া বাঁশের মাচায় চড়িয়া হরেক রকমের চীৎকার করিয়া সারা গ্রামে তাহারা এমন চমক লাগাইয়া দিল, যে কেনারামের ব্যবসা তাহাতে একেবারে মাটী হইতে বসিল। যাত্রায় খরচ ও বায়নাক্কা বিস্তর, তার উপর ঐ ছুড়িদের গানে নব্য পল্লীর কান ঝালাপালা

হইয়াছিল, এবং ঐ যে আসরে বসিয়া যশোদা বৃন্দা প্রভৃতি নিতান্ত নির্লজ্জ ভাবে ধূমপান করে,—এ সমস্ত ব্যাপার দর্শকের চোখে থিয়েটারের নেপথ্য-যবনিকার অন্তরালে অত্যন্ত বীভৎস কদর্য্য ঠেকিতে সুরু করিয়া ছিল, কাজেই সখের থিয়েটারগুলা পর্দ্দা খাটাইয়া আমোদ জোগাইয়া অতি-সহজেই সকলের চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় দাওয়ায় বসিয়া চালের খুঁটিতে পিঠ ঠেশ্ দিয়া কিঙ্করী অনেক কথা ভাবিতেছিল।

আকাশের পুব্ দিকে একটু-একটু করিয়া মেঘ জমিতেছিল, বাতাসে ভিজা মাটির একটা মিষ্ট গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। কিঙ্করী স্বামীর আশায় পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। কেনারাম গিয়াছিল ও-পাড়ায়,—তাহারই কথায় বিধু গাঙ্গুলির বাড়ী দুর্গোৎসবে বায়না ঠিক করিতে।

বিধু গাঙ্গুলি দিগম্বরের আমলের যাত্রার পৃষ্ঠপোষক, দেশের একজন প্রবীণ সৌখীন ব্যক্তি। দুর্গোৎসবে পূজার কয়টা দিন এ-দলের সাদর নিমন্ত্রণ সে-বাড়ীতে একেবারে বাঁধা বরাদ্দ। কিন্তু এবারে মহালয়ারও পর-দিনও যখন বুড়া সরকার মহাশয় আসিয়া পালা ঠিক করিয়া দিয়া গেল না, তখন কেনারামের কেমন ভাবনা হইল, বুকটাও ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে ভাবিল, এখানকার অন্নও বুঝি মারা গেল!

আখড়ায় সকালে সেদিন কমলে-কামিনী পালার মহলা চলিয়াছিল। স্ত্রী কিঙ্করী শ্রীমন্ত সাজিয়া গাহিতেছিল—

কে কামিনী কমল-বাসিনী!
কালীদহের কালো জলে, আলো ক'রে

পায়ে চাঁদ লোটে ওই শত ছলে—
করী গেলে বামা অমল-হাসিনী!

এমন সময় কেনারাম আসিয়া বলিল,—গান থামা কিঙ্করী। বিধু গাঙ্গুলির লোকের আজো দেখা নেই, কার জন্তে আর এ-সব কর্‌ছিস্?

তখন চকিতে দলে কেমন বিমর্ষতার ছায়া পড়িল। বিপুল উৎসাহ দারুণ অবহেলার ঘা খাইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। আখড়ায় লোক ইদানীং পূর্ব্বেকার মত নিত্যই আসে, গান হয়, গল্প চলে, কিন্তু কোনটাই তেমন জমে না। আজ কেনারামের কথায় সকলেরই মুখ শুকাইয়া দুঃখে বুক ভরিয়া উঠিল। দেখিয়া কিঙ্করীই তাই স্বামীকে বলিয়া কহিয়া দুপুর বেলায় গাঙ্গুলি-বাড়ীতে বায়নার সন্ধানে পাঠাইয়াছিল, এবং এই সন্ধ্যার সময় স্বামীর আশায় পথ চাহিয়া বসিয়া সে পুরানো সেই দিনের নানান্ কথা ভাবিতেছিল। দিনের শেষ আলোটুকু যখন একেবারে নিবিয়া গিয়াছে, তখন বাহিরে কেনারামের গলা শুনা গেল—আখড়া তুলে দে রে বিশু, দেশে আর থাকা হল না।

কিঙ্করী উঠিয়া দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—কি হলো?

—কি আর হবে! বাবুর ছেলে, ঐ যিনি কলকেতায় পড়েন, সেই চোখে চশমা-আঁটা,—তিনি বলেছেন, যাত্রা-টাত্রা হবে না আর! শুধু কতকগুলো মুখ্যু গুলিখোরের বিকট চীৎকার, শুনে প্রাণ জ্বলে যায়! তার চেয়ে থিয়েটার হোক। তারা না কি ঐ মহম্মদ খিলিজী আর বেদম প্রহারের পালা দেখাবে।

কেনারামের চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কিঙ্করী বলিল,—তাহলে আর উপায় কি!

কেনারাম আগাইয়া আসিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল, বলিল,—বাবুর আমাদের দয়ার শরীর। আজকালের ছেলে, তার কথা একেবারে ত আর ঠেল্‌তে পারেন না, অথচ আমাদেরই বা ফেলেন কি বলে? তাই তিনি বললেন, বেশ, তিন দিন ত—তার দুদিন ছেলেদের দল থিয়েটার দেখাক্‌, আর বাকী দিনটায় যাত্রা হোক্‌! যাত্রা আমি একেবারে বন্ধ করতে পারবো না। যে ক'দিন আমি বেঁচে আছি, সে ক'দিন অন্ততঃ নয়। তাই ঐ শেষের দিনের জন্য আমায় বললেন, তোমার কমলে-কামিনীর পালা দেখিয়ে দাও হে কেনারাম।

কিঙ্করী বলিল,—ভগবান তাহলে একেবারে বিরূপ হননি! যাক্‌, তাহলে ভালো করে আখড়া বসাও—

—আর আখড়া কিসের কিঙ্করী? বছরে একদিন একটা বাড়ীতে পালা দেখাবার জন্যে এত মাথা ঘামানোয় লাভ কি? এত খরচ-পত্তর!

—তা ঠিক।

কিঙ্করীর মুখে আর কথা ফুটিল না। নবমীর দিন পালা দেখানো হইবে ভাবিয়া একটুখানি আনন্দ তাহার বুক-ভরা বিপুল আঁধারের মধ্যে প্রদীপের আলোর মত যে ক্ষীণ রশ্মিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, স্বামীর এই শেষ-কথার ফুৎকারে সে আলোটুকুও নিবিয়া গেল। আহা, স্বামী কত যত্নে এই নূতন পালাটি বাঁধিয়াছে—এত টানাটানির মধ্যেও ঘরের জিনিষ বেচিয়া পয়সা জুটাইয়া কতখানি আশায় আখড়া বসাইয়াছে। থিয়েটারের

দলগুলাকে গানে অভিনয়ের ভঙ্গীতে হারাইয়া দিবে বলিয়া স্বামী বড় দমে বুক বাঁধিয়াছে,—সেও কত করিয়া বিচিত্র নূতন সুরে শ্রীমন্তর গানগুলিতে প্রাণ জোগাইয়াছে। অত সাধে অত আশায় এমনি করিয়াই কি নিষ্ঠুর আঘাত দিতে হয়, ভগবান!

যাত্রার দলে কিঙ্করী মানুষ হইয়াছে। এই যাত্রার দল একদিন তাহার শিশু-চিত্তে অপূর্ব্ব মোহের সঞ্চার করিয়াছিল, আর আজ বিচিত্র রসে তাহার তরুণ যৌবনটিকে ফেনিলোচ্ছল করিয়া তুলিয়াছে! গানের ছন্দের দীপ্ত মায়া-লোকে বসিয়া কতদিন যে সে আপনাকে অসামান্যা মনে করিয়া গর্ব্বে সারা হইয়া উঠিয়াছে! আবার এই যাত্রার দলেই শ্রীরাধার প্রেম-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া তাহার কিশোর হৃদয়ে প্রেমের সাড়া মিলিয়াছে! কত সাধ, কত আশা, কত, ক্ষোভ, কত তৃপ্তি—কি বিচিত্র লীলায় ঢেউ তুলিয়া গিয়াছে! এই যাত্রার দল তাহাকে প্রাণ দিয়াছে, তাহার মনের খোরাক জোগাইয়াছে! সে-ও এই দলের জন্য কি না করিয়াছে! ছোটখাট সমস্ত ত্রুটির দিকে সর্ব্বক্ষণ কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে রাখিয়া আসিয়াছে! এ দলে এই যে আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা, অদ্ভুত পারিপাট্য বিরাজ করিতেছে, এ শুধু তাহারই গুণে! যাত্রার দলের জন্য খাটিয়া কখনও তাহার শ্রান্তি হয় নাই। বিদেশে দলের সামান্য একজনের অসুখ হইলেও স্বামী যখন ভাবিয়া কূল পায় নাই, কিঙ্করী তখন অপরূপ সহজ ভঙ্গীতে সেই রোগীর সেবার ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে। দলের কাহারো টাকা-কড়ির প্রয়োজন হইলে গোপনে আসিয়া যখনই তাহারা কিঙ্করীর কাছে হাত পাতিয়াছে, তখনই কিঙ্করী

টাকা দিয়াছে, কখনও একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাই! কেহ সে টাকা শোধ করিতে না পারিলে কিঙ্করী কোনদিন অনুযোগ করে নাই বা স্বামীর কাছে নালিশের সুরে ইঙ্গিতেও সে কথা উত্থাপন করে নাই! তাই আজ দলের লোক পয়সা না পাইলেও নিত্য এখনও আখড়ায় আসিয়া যোগ দেয়, ভবিষ্যতের রঙিন চিত্র আঁকিয়া কিঙ্করীর নিরাশ চিত্তে আশার সঞ্চার করিয়া তোলে! আজ নিজের প্রয়োজনে টাকার টান দেখিয়া কিঙ্করী একান্তে বসিয়া শুধু চোখ মুছিত, কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া দুঃখ জানায় নাই।

৩

নানা দুর্ভাবনায় কেনারামের শরীর-মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ভাদ্র মাস পড়িতেই রাত্রে অল্প অল্প জ্বর দেখা দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কাশি। দেখিয়া কিঙ্করীর সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। এক নিমেষে তাহার মুখ শাদা হইয়া গেল।

আর এখন দল! কিসের জন্য, কাহার জন্যই বা দল! কেনারামের বলিয়াই না যাত্রার দলের উপর তাহার এতখানি দরদ ছিল! দল ভাঙ্গিয়া দিয়া গায়ের গহনা বেচিয়া স্বামীর চিকিৎসার জন্য সে স্বামীকে লইয়া কলিকাতায় আসিল। সঙ্গে আসিল শুধু বিশু।

কার্ত্তিকের শেষে জ্বরটা একটু ছাড়িতে ডাক্তার বলিল,—এই বেলা হাওয়া বদ্‌লাইতে পারো ত সারিবার সম্ভাবনা আছে, না হইলে—

কথাটা ছুরির ফলার মত কিঙ্করীর মর্ম্মে বিঁধিল। কেনারামের কঙ্কাল-সার দেহের পানে চাহিয়া তাহার অন্তর একেবারে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঘর-বাড়ী সব বেচিয়া স্বামীকে সে পশ্চিমের একটা জায়গায় হাওয়া বদ্‌লাইতে পাঠাইল। নিজে সঙ্গে গেল না। যাওয়া চলে না! সে গেলে বিদেশে স্বামীর খরচ যোগান হয় কি করিয়া? তাই সে কলিকাতায় থাকিয়া গেল। বিশু চালাক ছোকরা—রোগ-তদ্বিরের ফাঁকে ফাঁকে কোথায় সে একটা কাজ বাগাইয়া লইয়াছিল। এখন বিশুই কিঙ্করীকে এক অফিসের বাবুদের মেশে একটা ঝীয়ের চাকরি জুটাইয়া দিল। তাহার মহা-দুর্ভাবনা দূর হইল।

সারাদিন কাজ-কর্ম্মের মধ্যে সময় একরূপ কাটিয়া যাইত, কিন্তু বিপদ ঘটিত রাত্রিবেলায়। চারিধার যখন নিস্তব্ধ, অতল আঁধারে ঢাকিয়া আসিত, সেই আঁধারের অতল গহ্বর হইতে দূষিত বাষ্পের মত রাশি রাশি দুশ্চিন্তা আসিয়া কিঙ্করীকে ছাইয়া একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিত। মাথার শিয়রের জানালা খুলিয়া দিয়া সে একটা মাদুরে গা গড়াইয়া শুইয়া পড়িত। কলিকাতার রাজপথে অত রাত্রেও চলন্ত মানুষের জুতার ভারী শব্দ, অদূরে তেলের কলের একঘেয়ে ঘর্ঘরধ্বনি, গাড়ী-ঘোড়া-মটর-মাতাল-পুলিশের বিচিত্র কলরব বিচিত্র সুরে চারিধার মুখরিত করিয়া চলিয়াছে—কিছুই তাহার মনে একটা আঁচড় টানিতে পারিত না। সে জানলার ফাঁক দিয়া আকাশের পানে চাহিয়া পড়িয়া থাকিত। থানার ঘড়িতে বারোটা, একটা, দুইটা, তিনটা বাজিয়া যাইত,

তবুও চোখে ঘুম আসিত না! অতীতের সহস্র স্মৃতি অজস্র শর সন্ধান করিয়া তাহাকে কাতর ব্যথিত করিয়া তুলিত। হায়রে, বেচারী স্বামী এখন কোথায় কতদূরে কোন্ বিদেশে সেই রুগ্ন শরীর লইয়া পড়িয়া আছে! দেখিবার কেহ নাই, কথা কহিয়া দুইদণ্ড একটা সান্ত্বনা কি আশ্বাসের কথা বলিতেও কেহ নাই! পিপাসায় না জানি শুইয়া পড়িয়া কত ছট্‌ফট্ করিতে হয়, মুখে জলটুকুও পড়ে না! আহার জোটে কি না, তাই বা কে জানে! ভাবিয়া সে আর কোন কূল পাইত না। দুঃখে চোখে হু-হু করিয়া জল ঝরিত, বেদনায় বুকের পাঁজরাগুলা টন্ টন্ করিয়া উঠিত। নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিত, কাহার পাপে তাহাদের অমন সোনার নীড় আজ এমন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল!

এমনি দুর্ভাবনার মধ্যে একদিন চূড়ান্ত ঘটনাটাও ঘটিয়া গেল। সেদিন সন্ধ্যার পর বক্ষে বিস্তর পোষ্ট অফিসের ছাপ পরিয়া এক চিঠি আসিয়া হাজির, খামের উপরে নানা দেশের অসংখ্য অস্পষ্ট ছাপ, খামের মধ্যে চিঠিতে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা আছে,—কাল রাত্রে মুখে রক্ত উঠিয়া কেনারাম বাবু হঠাৎ মারা গিয়াছেন।

সব ফুরাইয়াছে! চিরদিনের সহচর, বন্ধু সহসা স্বপ্নের মত কোথায় কোন্ ছায়ার মধ্যে চকিতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! বাহিরের আকাশ-ভরা জ্যোৎস্নার গায়ে কে যেন গাঢ় কালি ঢালিয়া দিল!—

মাগো—বলিয়া চীৎকার করিয়া কিঙ্করী ধূলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

৪

তিন মাস পরে হঠাৎ একদিন গঙ্গার ধারে বিশুর সঙ্গে কিঙ্করীর দেখা। কেনারামের মৃত্যুর পর কিঙ্করী মেশের চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছিল। দিক্‌বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া গঙ্গার ধারে ঠাকুর-বাড়ীতে সে যে কি করিয়া আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, সে সব কথা কিঙ্করীরও স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে না।

বিশু বলিল,—জন্ম-মৃত্যু বিধাতার লিখন, কিঙ্করী, এ রকম ভেবে-কেঁদে আর কি করবে, বল? তোমার চেহারা যা হয়েছে, দেখচি, তাতে হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না মোটে! আমারি প্রথমটা চিনতে কষ্ট হচ্ছিল! যাক্, জানো ত, বিপদে ধৈর্য্য ধরতে হয়। তুমি ত বোঝ সব, তোমায় আর কি বোঝাব, বল?

বিশুর পানে চাহিয়া কিঙ্করী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, কোন কথা বলিল না। বিশুকে দেখিয়া অতীতের সব কথা আবার নূতন করিয়া তাহার মনে পড়িল। সেই গান-বাজনার বিপুল সমারোহ, আনন্দ-কৌতুকের বিরাট মেলা! সে কি ঘটা! আর আজ?

বিশু বলিল—কিনুর কথা যখন ভাবি, তখন আর জ্ঞান থাকে না। আহা, বেঘোরে প্রাণটা দিলে বেচারা! তোমার সঙ্গেও বোধ হয় শেষ দেখা হয় নি?

কিঙ্করী মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চোখের কোণে জল উপছাইয়া আসিল।

বিশু আবার ডাকিল,—কিঙ্করী—

বিশুর গলার স্বর ঈষৎ ভারী। কিঙ্করী মুখ তুলিয়া বিশুর পানে চাহিল, দেখিল, বিশুর চোখে জল।

কিঙ্করী আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না। তাহার চোখে বন্যা নামিল।

বিশু বলিল,—এখানে পড়ে থাকে না, কিঙ্করী—এসো, আমার সঙ্গে এসো—। বিধাতার কৃপায় আমার অবস্থা একটু যাহোক্ ফিরেচে, এখন। নিজে ছোট-খাট একটা খাবারের দোকান করেচি—মন্দ চলছে না! তুমি পুরোনো বন্ধু—আমি থাকতে তুমি পথে দাঁড়াবে! এ হতেই পারে না!

বিশুর খাবারের দোকান বেশ চলিতেছিল। এই দোকান-টিকে আশ্রয় করিয়া তাহার অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছিল। তবে দোকানে সে একা। স্ত্রী বেচারী দেশে ছিল, অবস্থা ফিরাইয়া স্ত্রীকে সে কলিকাতায় আনিয়াছিল। কিন্তু বেচারার অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য সহিল না। সে আজ ছয়-সাত মাসের কথা, স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে! সংসারে আবার সে এখন একা। পয়সার মুখ দেখিয়া ও পাঁচটা লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়াই সে স্ত্রীর শোক ভুলিয়াছিল। তবে রাত্রে দোকান বন্ধ করিবার পর নিরালায় একলা যখন সে পড়িয়া থাকে, তখন সমস্ত জগৎ তার বিরাট শূন্যতা লইয়া বিশুর বুকের উপর চাপিয়া বসে! এই যে কাজ করা, গতর খাটানো, পয়সা-উপার্জ্জন, এ কেন রে, কেন? কাহার জন্য? কি হইবে এ টাকা উপার্জ্জন করিয়া? বিশুর সমস্ত মন টল্‌মল্ করিয়া উঠিত। তাহার মনে হইত, দোকান-পাট বেচিয়া দিয়া কোথাও সে চলিয়া যায়। কিন্তু রাত্রের সে সঙ্কল্প

দিনে কাজের ঝঞ্ঝাটে চাপা পড়িত! সকালে দোকানের ঘর খুলিতে না খুলিতে একটি-দুইটি করিয়া লোক আসিয়া দেখা দিত, —কাজের কথা এবং কাজের ভিড়ে রাত্রের বৈরাগ্যের সঙ্কল্প মন হইতে তখন একেবারে সাফ্ হইয়া মুছিয়া যাইত।

এমনি করিয়াই বিশুর দিন কাটিতেছিল,—হঠাৎ এমন সময় গঙ্গার ধারে কিঙ্করীর সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া গেল।

কিঙ্করী বিশুর কথায় রাজী হইয়া দোকানে আসিল। দোকান হাল-ভাঙ্গা নৌকার মত স্রোতের মুখে এতদিন নিজের ভাবেই ভাসিয়া চলিয়া ছিল—আজ কিঙ্করী আসিয়া পাকা হাতে নূতন করিয়া সেখানে হাল ধরিল।

সারাদিন কাজের ভিড়ে দুই জনের কথা-বার্ত্তা বড় হইত না। রাত্রের নির্জ্জনতায় দুই জনে বুকের মধ্য হইতে অতীত-স্মৃতির তল্পী বাহির করিয়া বসিত,—হাসি ও অশ্রুর রাশি সে! দুইজনে তখন নানা কথা হইত। পল্লীর সেই যাত্রার আসর, স্নিগ্ধ শ্যামল সেই তরু-কুঞ্জ, অবারিত পথ-ঘাট, ছায়ায় ঘেরা ছোট্ট নদীর তীর বায়োস্কোপের ছবির মতই কিঙ্করীর চোখের সাম্‌নে দিয়া অপরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্যে ফুটিয়া ভাসিয়া যাইত।

কাজেরও অন্ত ছিল না—তবু দুইজনেই বুঝিয়াছিল, কাহার জন্য, কিসের জন্যই বা কাজ করা! নিতান্ত উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন জীবন দুইটাকে বোঝার মত দুই জনে ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে! সীমাহীন এক অনন্ত পারাবারে দুইজনে যেন গা ভাসাইয়া চলিয়াছে—কোনদিকে কূলের রেখাও দেখা যায় না! কি উদ্দেশ্যে, কিসের সন্ধানেই বা মিছা এই-ভাবে ভাসিয়া বেড়ানো—! তার

চেয়ে হাত-পা এলাইয়া এই অসীম অনন্ত পারাবারে ডুব দিলেই ত সব গোল মিটিয়া যায়।

কিন্তু ডোবা গেল না। তাই একদিন ভাসিতে ভাসিতে একটা কথা বিশুর মনে হইল। আকাশে সেদিন বেশ জ্যোৎস্না ফুটিয়াছিল। দোকানের পিছনে খোলা একটু জায়গা ছিল—সেইখানে একটা বেঞ্চে বসিয়া দেওয়ালে পিঠ ঠেশ দিয়া কিঙ্করী আপন-মনে শ্রীরাধার বিরহ-গাথা গাহিতেছিল,

এমন জোছনা রাতি এমন মধুর বায়
তোমার বিরহ বঁধু, আর ত না সওয়া যায়—

ঠিক রে ঠিক! সত্যই আর সহ্য হয় না! বিশুর বুকের মধ্যে এক অসহ্য বেদনা ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠিল। কিঙ্করী মৃদু সুরে গান গাহিতে ছিল। বিশু পা টিপিয়া আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। কিঙ্করীর মুখে জ্যোৎস্না একেবারে লুটাইয়া পড়িয়াছিল—তাহার সে মূর্ত্তি দেখিয়া আর তাহার কণ্ঠে ঐ গান শুনিয়া বিশুর মনে হইল, কিঙ্করীকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের বিরহ-বেদনা যেন আজ এই চাঁদের আলোয় আপনাকে মুক্ত করিয়া ধরিয়াছে!

গাঢ় স্বরে বিশু ডাকিল,—কিঙ্করী—

কিঙ্করী চমকিয়া উঠিল।

বিশু বলিল,—আবার তুমি সেই সব কথা ভাবছ!

কিঙ্করীর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। সে বলিল,—না ভেবে পারি কৈ?

বিশু কহিল,—ঠিক বলেচ। আমিও আর পারচি না। ভেবে লাভই বা কি বল—? শুধু মন খারাপ করা বই ত নয়। তাই

আমি ভাবছিলুম, এ রকম করে ত আর টেঁকা যায় না। তাই বল্‌ছিলুম কি, জানো?

কিঙ্করী বিশুর পানে চাহিল,—চোখের দৃষ্টি তার পুতুলের চিত্র-করা দৃষ্টির মত। কিঙ্করী কহিল,—কি? স্বরটা শুষ্ক, রুক্ষ মনে হইল। সে স্বর শুনিয়া বিশু কেমন ভড়কাইয়া গেল—তবুও সে জোর করিয়া কথা কহিল; বলিল,—আমার সঙ্গে যদি কণ্ঠী-বদল—

কথাটা শেষ হইল না। কিঙ্করী ডাকিল,—বিশু—

এই ছোট ডাকটুকুতে আগুনের হল্‌কার মত এতখানি তীব্র ভর্ৎসনা ঠিক্‌রিয়া পড়িল যে বিশুর সমস্ত সাধ-আশা শুকাইয়া ঝরিয়া গেল।

এ ঘটনার পর দোকানের কাজে কিন্তু কোন গোল দেখা গেল না। বিশু ভৃত্যের মত কাজ করিতে লাগিল, এবং কিঙ্করীরও তাহাকে ফাই-ফরমাস করিতে এতটুকু সঙ্কোচ দেখা গেল না। অর্থাৎ দুইজনের মনে-মনে এতখানি সংঘর্ষ হইয়া গেলেও বাহিরের লোক তাহার এতটুকু আঁচ পাইল না। দুইজনে পূর্ব্বের মতই কাজ করিতে লাগিল,—ঠিক যেন কলের পুতুল কলে কাজ করিয়া চলিয়াছে!

ইহার একমাস পরে বিশুকে হঠাৎ একটা বড় কাজের অর্ডার লইয়া মফঃস্বলে যাইতে হইল।

কিঙ্করী নিজের হাতে বিশুর জিনিষ-পত্র গুছাইয়া দিল, বিদেশে সাবধানে থাকিতে সহস্রবার উপদেশ দিল। যাইবার সময় বিশু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—আমার আবার ভাল থাকা—!

—কেন ? অসন্দিগ্ধ অচপল স্বরেই কিঙ্করী এ প্রশ্ন করিল।

বিশু অত্যন্ত হতাশভাবে কিঙ্করীর পানে চাহিল ; কিঙ্করী সে দৃষ্টি দেখিল। সে মুখ ফিরাইয়া লইল—তাহার চোখ সজল আর্দ্র হইয়া উঠিল। কিঙ্করী অতি কষ্টে একটা নিশ্বাস চাপিল, মুখে কোন কথা ফুটিল না।

বিশু চলিয়া গেলে কিঙ্করীর পক্ষে কিন্তু একলা দোকানে টেঁকা দায় হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, জীবনের ফাঁকগুলা কোথা দিয়া ভরিয়া আসিতেছিল, আবার সব শূন্য হইয়া গেছে। রাত্রে বিছানায় পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া চাপা গলায় সে ডাকিল,—বিশু—

কেহ সাড়া দিল না! কিন্তু কবেকার সেই জ্যোৎস্না রাত্রির এক হতাশ-কাতর দৃষ্টি কিঙ্করীর মনে জাগিয়া উঠিল—জগতে আজ যেন আর কিছু নাই, শুধু ঐ হতাশ-কাতর-দৃষ্টি ছাড়া!

৫

দোকানে বিশুর এক বন্ধু জুটিয়াছিল, বনমালী। বনমালী প্রায় তাহারই বয়সী। সে বিস্তর কথা কহিতে পারে, এক মার্চেন্ট অফিসের হেড-বিল-সরকার। তাহার দৌলতে অফিসে বিশুর কয়েকটি বাঁধা খরিদদারও জুটিয়াছিল।

কিঙ্করীর অবস্থা দেখিয়া বনমালীর দুঃখ হইল। বিশু ও কিঙ্করীর মধ্যে সম্পর্কটা সঠিক না জানিলেও রসজ্ঞ সে নিজে হইতে একটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। কাজেই রাত্রের নির্জ্জন অবকাশে বনমালী প্রায়ই আসিয়া দেখা দিত,

যদি. কথায়-বার্ত্তায় কিঙ্করীকে সে একটু সান্ত্বনা দিতে পারে!

বনমালী বেশ বাঁশী বাজাইতে পারিত। সে দোকানে বসিয়া বাঁশী বাজাইত, অনেক সময় বাঁশীর সুরে সব ভুলিয়া কিঙ্করীও সে বাঁশীর সঙ্গে গান ধরিত। তা-ছাড়া বনমালীর প্রতি কিঙ্করীর একটু মায়া পড়িয়াছিল। মায়া পড়িবার কারণ ছিল।

বনমালীর বাড়ী আমতার ওদিকে। এখানে চাঁপাতলার একটা মেসে সে থাকিত। দেশে ছিল স্ত্রী ও একটি ছেলে। স্ত্রীর সঙ্গে মোটেই বনিবনা ছিল না। স্ত্রীর চরিত্র-সম্বন্ধে দেশের লোক কাণাঘুষা একটু-আধটু করিত। সে রহস্যালাপ বনমালীর অশ্রুত ছিল না, এবং স্ত্রীর চিত্তও বনমালীর প্রতি বড় প্রসন্ন ছিল না, কাজেই স্ত্রীকে বনমালী মোটেই দেখিতে পারিত না,—তবে ছেলেটির জন্য তাহার থাকিয়া থাকিয়া মন কেমন করিত, তাই মাসে একটি দিনের জন্যও অন্ততঃ সে একবার দেশে গিয়া ছেলেটিকে দেখিয়া আসিত! সে-সময় ছেলের জন্য নানান জিনিষ সে কিনিয়া লইয়া যাইত,—পুতুল, লজনচুষ, লাট্টু, টিনের বাঁশী—এই সব। মাঝে মাঝে টাকাও পাঠাইত।

কিঙ্করী বনমালীর এ দুঃখের কাহিনী শুনিয়াছিল। শুনিয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছিল। বেচারা বনমালী!

ব্যাপারটা তাহার কেমন আশ্চর্য্য ঠেকিত। নারী ভাল না বাসিয়া কি করিয়া থাকে! নারী যে বড় দুর্ব্বল, একটা অবলম্বন যে তার চাইই! তাই সে বনমালীকে প্রায়ই বলিত,—বউটিকে ছেলেটিকে এখানে নিয়ে এসো, ঠাকুরপো, এনে নিজের কাছে তাদের রাখো। ছেলেটির মুখ চেয়ে বৌকে সহ্য করে

চল ভাই, তার উপর কোন দুর্ব্যবহার করো না। ছেলেমানুষ, কাছে থাকলে ও-সব বুদ্ধি তার সেরে যাবে'খন।

বনমালী বলিত,—তুমিও যেমন বিশুর বৌ!

বনমালী কিঙ্করীকে বিশুর বৌ বলিয়া ডাকিত। শুনিয়া কিঙ্করী মনে মনে হাসিত, কিন্তু কথায় বা ভঙ্গীতে কখনও আপত্তি কি বিরক্তি প্রকাশ করে নাই! আজ এ সম্বোধনটা প্রাণের মধ্যে কোথায় এক সুপ্ত তারে ঘা দিল। সমস্ত প্রাণ অব্যক্ত যাতনায় ছটফট করিয়া উঠিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কিঙ্করী বলিল,—কেন আনবে না, শুনি?

বনমালী বলিল,—পাগল হয়েছ তুমি! এখানে একটা কেলেঙ্কারী হবে কি শেষে!

কিঙ্করী বলিল,—কিসের কেলেঙ্কারী! আচ্ছা, আমার কাছে নিয়ে এসে তুমি রাখো দেখি। আমি কেমন না বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে ভাল করতে পারি! দেখ।

বনমালীর চোখ ছলছল করিয়া আসিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,—আচ্ছা, সে দেখা যাবে তখন। বলিয়াই বাঁশীটা উঠাইয়া লইয়া সে বাজাইতে বসিল। কিঙ্করী নির্নিমেষ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। বাঁশীর করুণ সুরে তাহার চিত্তে দারুণ বেদনা জাগিয়া উঠিল। সে অপলক স্থির দৃষ্টিতে বনমালীর পানে চাহিয়া রহিল। তাহার সে দৃষ্টি বনমালীর বাহিরটা ভেদ করিয়া সমস্ত অন্তরখানা দেখিয়া লইল—অশ্রুর রাশি সেখানে একেবারে টল্ টল্ করিতেছে! সেই সঙ্গে আর-একটা ছবিও চোখে পড়িল। পল্লীর মাজা-ঘষা ছোট্ট একটি আঙিনা, হরিণ-শিশুর মত ছেলেটি লাফাইয়া খেলিয়া

বেড়াইতেছে, আর মেটে দাওয়ায় বনমালীর তরুণী স্ত্রী বসিয়া দাঁতে ফিতা চাপিয়া ধরিয়া চুল বাঁধিতেছে, সম্মুখে আর্শি-চিরুণী পড়িয়া আছে! আর্শির বুকে নবযৌবনা রূপসীর দৃষ্টির সগর্ব্ব ভঙ্গীটুকুও তাহার দৃষ্টি এড়াইল না।

মফঃস্বল হইতে বিশু বাড়ী ফিরিল, জ্বর-গায়ে। কিঙ্করী চিন্তিত হইল, এতটুকু বিলম্ব না করিয়া বড় বড় ডাক্তার আনাইল, ঔষধের শিশিতে ঘর ভরাইয়া দিল। ঔষধ খাওয়াইয়া, গা ফুঁড়িয়া ডাক্তারের দল নিমকের মর্য্যাদা এতটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিলেন না। শিয়রে বসিয়া কিঙ্করী বিস্তর সেবা করিল, রাত্রি জাগিল, কাঁদিয়া কত ঠাকুরের মানত করিল, কিন্তু সে সমস্তই ব্যর্থ করিয়া এক মাস রোগে ভুগিয়া বিশু এক প্রত্যুষে ইহজীবনের লীলা সাঙ্গ করিয়া কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেল।

ঘাট হইতে কিঙ্করীকে অতি কষ্টে যখন ঘরে আনা হইল, তখন সকলে দেখিল, এ যেন সে কিঙ্করী নয়, কঙ্কালের স্তূপ! সে-কিঙ্করীর একটা ম্লান ছায়া! ঘরে ফিরিয়া কিঙ্করী সেই যে শয্যা লইল, আর উঠিতে চাহিল না, দেখিয়া সকলে বলিল,—সবই বাড়াবাড়ি!

বনমালী পূর্ব্বের মতই দেখা করিতে আসিত, সান্ত্বনা দিত। সে বুঝাইত, জীবনটুকু হেলায় নষ্ট করিবার জন্য তৈয়ার হয় নাই। জীবনটাকে যখন রাখিতেই হইবে, নষ্ট করা চলে না, তখন মানুষের মতই সেটা রাখা দরকার। নহিলে পরের হাতে পুতুল হইয়া থাকাটা কিছু নয়! পরের দয়ায় চলা-ফেরা করা, বসা-দাঁড়ানো—ছি!

কিঙ্করী তাহার কথায় উঠিয়া বসিল। বনমালী তখন

শোক ভুলাইবার জন্য রাজ্যের খবর বহিয়া আনিতে লাগিল, কিঙ্করীও বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে সব শুনিত,—কিন্তু মনে সে সব ঢুকিত কি না, কে জানে!

দোকানের কাজে ক্রমে অত্যন্ত ত্রুটি দেখা দিল। বনমালী মাহিনা দিয়া লোক রাখিল। কিঙ্করীকে দেখিবার শুনিবার জন্য অবশেষে বনমালীকে মেশ ছাড়িতে হইল। সে এখন এখানেই থাকে, খাওয়া-দাওয়া এইখানে, রাত্রে এইখানেই শোয়। কিঙ্করীর মনে সান্ত্বনা দিবার জন্য বাঁশীও মাঝে মাঝে বাজাইতে হয়, গল্পও বাদ যায় না।

পাড়ার লোকে রহস্যের সন্ধানে উন্মুখ হইয়া ছিল, এই ছোটখাট ব্যাপারটায় তাহারা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ব্যাপারটা তাহাদের অনেকখানি রসালাপের খোরাক জোগাইয়া দিল। তাহারা এই বিষয়ের আলোচনায় মাতিয়া মশ্‌গুল হইয়া উঠিল। আলোচনার দুই-একটা ইঙ্গিত বনমালী ও কিঙ্করী—দুইজনেরই কানে গেল। শুনিয়া বনমালী হাসিল, কিঙ্করী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

রহস্যের বিচিত্র ইঙ্গিত-সত্ত্বেও দিনগুলা আবার সহজ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু কিঙ্করীর অদৃষ্টে দিনগুলা নাকি অবিরাম সহজে কাটিতে পারে না, তাই সাহেবের হুকুমে বনমালীকে অকস্মাৎ এক দিন চাটগাঁয়ে চলিয়া যাইতে হইল; সেইখানেই তাহাকে এখন থাকিতে হইবে। সে চলিয়া গেল।

তখন নির্জ্জন অবসরে নিভৃত ঘরের কোণে পড়িয়া কিঙ্করী আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা একবার আলোচনা করিয়া দেখিল; দেখিয়া দোকানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে চারিধারে বিপুল পরিবর্ত্তন চলিয়াছে—পুরাতন

মহল্লা ভাঙ্গিয়া নূতন মহল্লার পত্তন হইয়াছে, বহুকালের সাবেক বাড়ী ভাঙ্গিয়া নূতন পথ-ঘাট দেখা দিতেছে। সময় চলিয়াছে, না, স্রোত ছুটিয়াছে! কিঙ্করীর দোকান-ঘর অযত্নে কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে, সম্মুখের পর্দ্দাখানা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ঘরের দেওয়াল ধোঁয়ায় ঝুলে আচ্ছন্ন, তাহার নিজের মাথার চুলে অবধি পাক ধরিয়াছে। তাহার উপর লোকগুলাও বদ্‌লাইয়া গিয়াছে,—পূর্ব্বে যাহারা ডাকিয়া কথা কহিত, এখন তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়! কিঙ্করী ইহার অর্থ বুঝিল; বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিল। কি অসহ্য জীবন! কাহারো চিত্তে এতটুকু সহানুভূতি নাই! একলা এই শোকের বোঝা ঘাড়ে করিয়া চলিতে তাহার শ্রান্তি ধরিয়াছে, পা আর চলিতে চাহে না, ইহার জন্য করুণা দূরে থাক্—নির্ম্মম নিষ্ঠুর সমালোচকের মত ক্রূর হাসি মুখে লইয়াই সব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুর্ব্বলের পানে চাহিয়া আছে! কিঙ্করী ভাবিল, আর না! সেই অতীত, মধুর অতীত,—আহা, তেমন দিন কি জীবনে আর কোন দিন মিলিবে রে? না, না! দীর্ঘনিশ্বাস বুকের মধ্যে ঝড়ের মত আথালি-পাথালি করিয়া উঠিল। বুকে কে যেন মুগুরের ঘা মারিল। মনের হ্রদটুকু বেদনার শৈবালে এমনি আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল যে সে বাহিরের কোন আঘাতে আর এতটুকু চঞ্চল হয় না। বিছানায় শুইয়া আকাশের পানে শূন্য দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকে—আকাশে সেই চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, রাত্রি হয়, সবই ঠিক আগেকার মত, কিন্তু তাহার প্রাণে কোনটাই আর এতটুকু আলো-আঁধারের পরশ জাগাইতে পারে না! সে যেন জমিয়া পাথর হইয়া গিয়াছে!

৬

শ্রাবণ মাসের সন্ধ্যা। কিঙ্করী একা দোকানে বসিয়াছিল—সরকার তাগাদায় বাহির হইয়াছে, এমন সময় মস্ মস্ করিয়া একজন লোক আসিয়া দোকানে ঢুকিল। কিঙ্করী চাহিয়া দেখে, এ কি স্বপ্ন? না, এ যে বনমালী। সত্যই ত, বনমালীই! বনমালীর চুল পাকিয়াছে, সে অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে! হঠাৎ দেখিলে তাহাকে চেনা যায় না! সেই বনমালী ছুইদিনে এ কি হইয়া গিয়াছে!

বিস্ময়ের মোহ কাটিলে কিঙ্করী একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। বনমালী জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন আছ কিঙ্করী?

কিঙ্করী বলিল—সত্যিই মনে পড়েছে? আবার তুমি ফিরে এসেছ!

—এসেছি কিঙ্করী। কিন্তু শোনো, অনেক কথা আছে। আমি আবার কল্‌কাতায় বদলি হয়েছি। এখানে থাকতে চাই। ছেলেটি বড় হয়ে উঠেছে, তাকে স্কুলে পড়াতে হবে কি না! আর তোমার কথাই রেখেচি—ঐ ছেলের জন্যেই স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা করে ফেলেচি।

—কোথায় তারা?

—তারা আমার এক আত্মীয়ের বাসায় এসে উঠেচে, রাম-কৃষ্ণপুরে—কিন্তু সেখানে থাকলে ত চলবে না। আমার ভারী অসুবিধা হবে, দেখব-শুনব কি করে? তাই এধারে একটা বাসা খুঁজতে বেরিয়েছি। ভাবলুম, দেখি, তুমি কেমন আছ। তাই—

—বাসা চাই ! আনন্দে কিঙ্করীর প্রাণটা দুলিয়া উঠিল। সে বলিল,—কেন, এইখানেই তোমরা থাকো না ! আমি দোকানের এক ধারে পড়ে থাক্‌বো'খন। যতদিন আমি বেঁচে আছি, আর যতক্ষণ হেথায় আমার একটু ঠাঁই আছে, ততক্ষণ কোথায় আবার তুমি পয়সা খরচ করে আলাদা বাসা নিতে যাবে ! কি বল ?

চারিধারে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বনমালী বলিল,—বেশ।

পরদিন মিস্ত্রী ডাকা হইল। ভাঙ্গা দেওয়ালে চূণ-বালি পড়িল —জানলাগুলা রঙের পরশ পাইয়া হাসিয়া উঠিল। কিঙ্করী নিজে ঘুরিয়া ফিরিয়া দোকান-ঘরটিকে পরিপাটী ছাঁদে সাজাইয়া তুলিল। আজ তাহার জীর্ণ দেহ-মনে নূতন বল নূতন শক্তি সে ফিরিয়া পাইয়াছে !

স্ত্রী-পুত্র লইয়া বনমালী অচিরে দেখা দিল। স্ত্রীটি সাদা-সিধা ধরণের মানুষ—তবে ভারী কড়া মেজাজ। দশ বৎসরের ছেলে খাঁদু রোগা। গালের উপর মস্ত একটা জড়ুল। ছেলেটি শান্ত। খাবারের পাহাড় দেখিয়া সানন্দে খাঁদু বলিল,—এত খাবার কে খাবে মাসিমা ?

কিঙ্করী তাহাকে বুকে টানিয়া বলিল,—তুমি খাবে, বাবা।

—এ-সব আমি খাব ?

—হ্যাঁ বাবা—বলিয়া কিঙ্করী মিষ্টান্ন তুলিয়া খাঁদুর হাতে দিল। খাঁদু সানন্দে তাহা মুখে পুরিল।

এই ছেলেটিকে বুকে ধরিয়া আজ কিঙ্করীর প্রাণ জুড়াইয়া গেল। এতদিনকার সঞ্চিত অত যে বেদনা, মুহূর্ত্তে তাহা কোথায় অদৃশ্য হইল। খাঁদুর মুখে চুমা দিয়া কিঙ্করী আদর করিল,—যাদু আমার, মাণিক আমার, সোনা আমার—

খাঁদু কহিল,—আমি অনেক বই পড়ি মাসিমা। সব মুখস্থ আছে—শুন্‌বে? দ্বীপ কাকে বলে, জানো? যে ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিকে জল, তাহাকে বলে দ্বীপ: কেমন, শুন্‌লে ত? তার চারিদিকে শুধু জল—কোন দিকে ডাঙ্গা নেই। তুমি দ্বীপ দেখেচ, মাসিমা?

—না বাবা।

খাঁদুর সঙ্গে কিঙ্করীর ভাব দুই দিনেই বেশ জমিয়া উঠিল। কিঙ্করী বসিয়া বসিয়া রূপকথা বলিত, আর খাঁদু নিবিষ্ট চিত্তে তাহা শুনিত। শুনিতে শুনিতে সে নানা প্রশ্ন তুলিত,—রাজার নাম কি? কত বড় বাড়ী? রাজা যুদ্ধ জানে? আমি বড় হলে যুদ্ধ করতে যাব, মাসিমা।...পরীর ডানা কি পাখীর মত? তার ল্যাজ আছে? তুমি পরী দেখেছ মাসিমা? এমনি বিস্তর কথা! কিঙ্করী নিজের হাতে খাঁদুকে স্নান করাইত, খাবার দিত, পোষাক পরাইত। খাঁদুর বাপ-মা অনেকখানি ঝঞ্ঝাটের হাত হইতে রক্ষা পাইল।

খাঁদু খাইতে বসিলে কিঙ্করী বলিত,—দেখ, খাঁদুকে একটা ভাল স্কুলে দাও, ও লেখা-পড়া শিখে মানুষ হবে। ডাক্তার হবে, উকিল হবে, কত পয়সা আন্‌বে ও। কি বল বাবা, তুমি উকিল হবে, ডাক্তার হবে,—কেমন?

—হ্যাঁ মাসিমা, আমি ডাক্তার হব, উকিল হব।

খাঁদুকে স্কুলে দেওয়া হইল। কিঙ্করী মাহিনা যোগাইত—মাহিনা দিয়া বাড়ীতেও সে মাষ্টার রাখিল। ছেলেটিকে লইয়া সে এক নূতন জীবনের পত্তন করিল।

খাঁদুর মার কিন্তু এখানে মন টিঁকিতে ছিল না। মাসখানেক

পরে একদিন সে বলিল,—দেশে বোনের বড় ব্যামো। বোনের দ্যাওর এসেছে আমায় নিতে। তার সঙ্গে গিয়ে বোনকে দেখে আসব। কিঙ্করীকে বলিল,—ছেলে ত দিদি, তোমারই ন্যাওটো হয়েছে। আমাকে ছেড়ে ও খুবই থাকতে পারবে—ওকে আর নিয়ে যাব না, কি বল? রাখতে পারবে ওকে?

একমুখ হাসিয়া কিঙ্করী বলিল,—তা ওকে আমি খুব রাখতে পারব, বৌ। তুমি স্বচ্ছন্দে ঘুরে এসো গে।

মা চলিয়া গেল। বনমালী বাড়ী ফিরিয়া কিঙ্করীর মুখে শ্যালীপতির ভাইয়ের বর্ণনা শুনিয়া দৃষ্টিটাকে একবার তীক্ষ্ণ করিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—রাখতে পারলে না ত বিশুর বৌ!

খাঁদু রাত্রে কিঙ্করীর কাছেই ভিতরের ঘরে শয়ন করিত। বনমালী আজকাল প্রায়ই বাড়ীতে থাকিত না; যেদিন থাকিত, সেদিন দোকান-ঘরে শুইয়াই রাত্রি কাটাইত। রাত্রে বিছানায় শুইয়া খাঁদু লক্ষ্মী ছেলেটির মত মাসীর কাছে গল্প শুনিত। নিজেও কত গল্প বলিত—স্কুলের কথা, মাষ্টারদের কথা, পোড়োদের কথা! বেহারী সেদিন পড়া বলিতে পারে নাই বলিয়া মাষ্টার মশাইয়ের কাছে কি মারটাই খাইয়াছে! মোধো এমনি পাজী যে পণ্ডিত মশাইয়ের ক্লাশে বইয়ের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া রোজ গাধার ডাক ডাকে, সেদিন ভুতো তাহাকে ধরাইয়া দিয়া হেড-মাষ্টারের কাছে আচ্ছা বেত খাওয়াইয়াছিল, মোধোও কিন্তু তেমনি, স্কুলের ছুটির পর ভুতোকে ঠ্যাঙাইয়া দিয়াছিল, শাণের উপর পড়িয়া ভুতোর দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। নূতন মাষ্টার এত-বেশী পড়া দেয় যে কোন ছেলেই তা মুখস্থ করিতে পারে না।

নিজের কি, মুখস্থ করিতে হয় না, শুধু বই ধরিয়া পড়া লওয়া —ব্যস্! মাষ্টারদের ভারী মজা! না, সে বড় হইয়া ডাক্তার হইবে না, উকিল হইবে না, স্কুলের মাষ্টার হইবে। এমনি নানা কথা অনর্গল সে বকিয়া যাইত, আর কিঙ্করী তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে সমস্ত শুনিত।

এই দশ বৎসরের বালকটি কিঙ্করীর মনের মধ্যে এমনি আধিপত্য বিস্তার করিল যে তাহার আর কেহ রহিল না, কিছু রহিল না। দশটা বাজিলে খাঁদুকে সাজাইয়া গুছাইয়া সে স্কুলে পাঠাইত—নিজে দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহার পানে চাহিয়া থাকিত। সে মোড় বাঁকিলে কখন যে নিজের অজ্ঞাতে কিঙ্করী তাহার পিছু-পিছু স্কুলের ফটক অবধি আসিয়া পড়িত, সেদিকে তাহার হুঁসই থাকিত না! খাঁদু হঠাৎ পিছনে মাসিকে দেখিয়া ঈষৎ অনুযোগের স্বরে বলিত,—আঃ, কি করছ মাসিমা? চলে যাও না, তুমি। এখনি ছেলেরা দেখতে পেলে আমায় ক্ষ্যাপাবে! তখন মাসির চমক ভাঙ্গিত—তাইত! এতদূর আসিয়া পড়িয়াছে সে! ফিরিবার পূর্ব্বে আর একবার খাঁদুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার সলজ্জ মুখখানিতে চুমা দিয়া মাসি বলিত,—এই যে যাচ্ছি, বাবা। বলিয়া আবার ঐ স্কুলের পানেই ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে কিঙ্করী দোকানে চলিয়া আসিত।

স্কুলের ছুটির পর দোকানের গলিতে ঢুকিয়া খাঁদু দেখিত, মাসিমা পথের পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে! খাঁদুর প্রতি কিঙ্করীর ভালবাসার সীমা ছিল না। খাঁদুর মুখে হাসি দেখিবার জন্য সে আপনার প্রাণটাকে আজ বলি দিতে পারে! এ যে কি সুখ! এত সুখ, এত আনন্দ তাহার

অদৃষ্টে ছিল! এ কল্পনাও যে তাহার মনে কোনদিন ঠাঁই পায় নাই! আর খাঁদুও তেমনি মাসি বলিতে অজ্ঞান। মাসির আদরে নিজের মা ও বাপের কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল।

কিন্তু এ আনন্দের মধ্যে বেদনাও অল্প ছিল না। যখন-তখন এক অজানা ভয়ে কিঙ্করীর বুক থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিত,—যদি হঠাৎ খাঁদুর মা আসিয়া এখন ছেলের দাবী করে! খাঁদুকে কাড়িয়া লইয়া যায়! ভাবিতে তাহার গা শিহরিয়া উঠিত! তাহার উপর ছেলে আসিয়া যখন অনুযোগের সুরে বলিত,—আমি ও ইস্কুলে আর পড়ব না, মাসিমা—এত পড়া দেয় যে মুখস্থ হয় না! তখন সে অস্থির হইয়া উঠিত, নিজের ভয় ভুলিয়া রাগে সে পথে-ঘাটে সকলকে ডাকিয়া বলিত,—দেখ দিকি দিদি, মিন্সেদের আক্কেল! এই দশবছরের ছেলে, ওকে কি না বারোখানা বই পড়তে দেছে! ছেলেটা কাল রাত দশটা অবধি জেগে বসে পড়ছিল—ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল, তবু শোনে না! এত বললুম, শো বাবা, শো, ঘুমো—তা বললে, না মাসিমা, ঘুমুলে পড়া হবে না, আর পড়া না হলে মাষ্টার মশায় মারবে। আমার ভাই ভারী ভাবনা হয়েছে, ছেলেটা দিন দিন পড়ার চাপে শুকিয়ে যেন দড়ি হয়ে যাচ্ছে। পরের ছেলে, ভালোয় ভালোয়—

এই কথাটা মনে হইতেই বুক আবার কাঁপিয়া উঠিত—জিভ্ কাটিয়া মনে মনে সে বলিত, না, না, খাঁদু আমার, আমার! যে মা অমন করিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহার আবার কিসের দাবী! সে আবার মা হইতে আসে কি বলিয়া? ওদিকে বাপের ত ঐ দশা! না, না, খাঁদু পরের নয় গো, সে আমার, আমার!

সেদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাল ঘুম হইতেছিল না।

শুইয়া সে ভবিষ্যতের নানা কথা ভাবিতেছিল,—খাঁদু বড় হইলে ডাক্তার হইবে, খুব বড় লোকের ঘরে কিঙ্করী তাহার বিবাহ দিবে। গাড়ী-ঘোড়া, লোক-জন, কত সে, ওঃ! কি অগাধ ঐশ্বর্য্যে চারিদিক ঝলমল করিবে—খাঁদুর ছেলে-মেয়েতে ঘর ভরিয়া যাইবে! তাহাদের কল-কল হাসি, সরল দুষ্টামি—! ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সহসা বাহিরের দ্বারে করাঘাত-শব্দ শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বনমালী সে রাত্রে দোকানে ছিল না, থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল। বুড়া বয়সে তাহার প্রাণে নিত্য নূতন সখ দেখা দিতেছিল।

উঠিয়া দ্বার খুলিয়া কিঙ্করী দেখে, এ ত বনমালী নয়,—এ যে খাঁদুর মাসির সেই দ্যাওরটি, যাহার সহিত খাঁদুর মা বোনের বাড়ী গিয়াছিল। খাঁদুর মার কাছ হইতে সে আসিয়াছে, খাঁদুকে লইয়া যাইবে। সেইখানেই সে এখন থাকিবে, সেখানে স্কুল আছে, ভগ্নাপতি ছেলেকে দেখিবে-শুনিবে! খাঁদুর মা আর কলিকাতায় আসিবে না। বনমালী ত ঐ! নেশা ধরিয়াছে, বদ্‌খেয়ালিও খুব, রাত্রে ঘরে থাকে না—খাঁদুর মার এ-সব সহ্য হইবে না। ছেলেকে এখনই চাই! না,—বনমালীর জন্য দাঁড়াইয়া দেরী করা চলিবে না—গাড়ী হাজির। খাঁদুকে ডাকিয়া দাও,—এখনই।

এই রাত্রে?

লোকটি কহিল,—হ্যাঁ, নৌকো এখনই ছাড়বে!

ভয়ে কিঙ্করীর সর্ব্বশরীর হিম হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবে সে? তাহার ত কোন জোর নাই! জোর করিলেই বা শুনিবে কে? আঁচলে চোখের জল মুছিয়া খাঁদুর কাপড়-চোপড়,

বই-শ্লেট, ব্যাট-বল যেখানে যাহা ছিল, সমস্ত গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া খাঁদুর বিছানার পাশে আসিয়া সে দাঁড়াইল। খাঁদু ঘুমাইতেছে, মুখে তাহার ফুলের মতই শুভ্র নির্ম্মল হাসি। সু-স্বপ্ন দেখিয়াছে, বুঝি! আহা, বাছারে! কিঙ্করী লুটাইয়া পড়িয়া তাহার কচি মুখখানি অজস্র চুমায় ভরাইয়া দিল।

বাহিরে ডাক পড়িল,—দেরী হয়ে যাচ্ছে যে গো—শীগ্‌গির খাঁদুকে নিয়ে এসো না।

নির্ব্বাক বেদনায় কিঙ্করীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু কি করিবে সে? তাহার কোন জোর নাই ত! পরের ছেলে খাঁদু! কিঙ্করী খাঁদুর কে? কেহ নয়। সে পর, পর—ওগো, পর!

কিন্তু সত্যই কি সে খাঁদুর কেহ নয়? বোনের শ্বাশুর আবার বাহির হইতে তাড়া দিল,—আঃ, মিছে দেরী করছ কেন গো! না পারো ত বল, আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসি—

না, না—চোখের জল মুছিয়া খাঁদুকে বুকে করিয়া আনিয়া কিঙ্করী গাড়ীতে তুলিয়া দিল, অত্যন্ত সাবধানে। বাছার ঘুমটুকু না ভাঙ্গে! আহা, কাল সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া যখন খাঁদু আর মাসিমাকে দেখিতে পাইবে না, তখন—? তাহাকেও আর কাল হইতে ভোরে উঠিয়া কাহারো জন্য খাবার সাজাইতে হইবে না! কতদূরে কোথায় থাকিবে খাঁদু, কে জানে! হয়ত বা এই দেখাই জন্ম-শোধ দেখা! গাড়োয়ান বলিল,—এই মাগী, হঠ্ যা—বলিয়া সে ঘোড়ার রাশে টান দিল। গাড়ী চলিল।

যতক্ষণ দেখা যায়, কিঙ্করী গাড়ীর পানে অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিল। গাড়ী গড়্ গড়্ শব্দে কলিকাতার নিস্তব্ধ রাজপথ সচকিত করিয়া ছুটিল। কিঙ্করীর মনে হইল, তাহার